

变化

变化

变化

变化

变化

变化

变化

变化

Change

Anjali

变化 Change

Change

Change



Have you tried Air India?

**Nonstop flights from Narita to India four times weekly
Flights from Osaka via Hong Kong to India three times weekly**



We invite you to experience Flying Returns – the mileage programme offered by Air India.

**For Information/Guidance: www.airindia.in
For Registration: www.flyingreturns.co.in**

**Tokyo Office: 03-3508-0261 (Reservation)
Osaka Office: 06-6264-1781 (Reservation)**



Durga Puja Program October 3, 2009



Puja	... 11:00 AM
Anjali	... 12:00 Noon
Prasad & Lunch	... 12:30 PM
Cultural Program	... 2:30 PM
Puja & Arati	... 5:00 PM

Cultural Programme 2:30 ~ 5:00 PM



Devi Vandana

Shilpi Banerjee
Samudra Dutta Gupta
Akshara Punyarthi, Ashita, Heijin, Mohima Kundu, Shoan Desai,
Monalisa Das, Shreya Das, Swarali Parasnis, Vlad Dogarel

Goopy Gyne Bagha Byne

Play based on the story written by Upendra Kishore Ray.

Goopy the singer, and Bagha the drummer are two simple, inept musicians, living in two different villages. Their music provokes ridicule from the villagers and contempt by their Kings who drive them out of the villages. Banished from their respective villages they meet in the forest and have a chance encounter with the King of ghosts who grants them three wishes – “Get food whenever they want, travel to any place they want to and enchant all with their music.” They reach the Kingdom of Shundi where they are made the court musicians. Soon they discover that the neighboring King of Halla, drugged and bewitched by his evil minister and magician is about to wage a war against the King of Shundi. Armed with their boons they dissuade the King of Halla and with their singing demobilizes the troops.

Cast: Amartya, Akash, Aneek, Arpan, Arunanshu, Damayanti, Joy, Madhumanti, Manav, Manjari, Maya, Nishant, Soumyadip, Subhankar, Sneha, Shivam, Soham, Tannishtha, Tuhin

Narration: Anirban Mukherjee Direction: Sudipta Roy Chowdhury

Music from Bollywood

Debarati Bose, Mitali Ghosh, Ritu Kumar, Puja Mukherjee,
Soma Choudhury

Memories of college campus

Arnash Gupta, Prantik Chakraborty

Pagol amar mon

Group dance by Rhythmaya

Akshara, Ashita, Heijin, Mohima, Shoan, Monalisa, Shreya,
Swarali, Shubhankar, Rishabh, Vlad
Choreographed by Vrushali Desai

Nana ronger dinguli

Anindya Bhattacharrya, Anirvan Mukherjee, Biswanath
Paul, Indranil Roy Chowdhury, Sanjib Chanda,
Viswa Ghosh, Kaori (Shanti) Izumida

Chhau Dance performance

Seraikalla Chhau group.
Visiting dance group from India

Stage, Light and Sound management

Sanjib Chanda, Biswanath Paul, Arup Bose, Prabir Patra,
Pranesh Kundu, Santanu Nag, Madhab Ghose,
Kaori Izumida, Atsushi Suzuki

Master of Ceremonies

Nandini Basu & Brajeshwar Bannerjee

Program coordinated by Rita Kar

Venue: Ota Bunkanomori Hall, Ota-ku, Chuo 2-10-1, Tokyo 143-0024, Tel.: 03-3772-0700

© 2009 Bengali Association of Tokyo, Japan (BATJ). All rights reserved.

Disclaimer: The articles compiled in this magazine are personal opinion of the authors and in no way represent any opinion of BATJ.



মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

CHIEF MINISTER
WEST BENGAL



Writers' Buildings, Kolkata-700 001
West Bengal, India
E-Mail : cm@wb.nic.in
Fax : 0091-033-22145480
Tel : 0091-033-22145555

No. 856 – P/CM
25 August, 2009

I am happy to know that the Bengali Association of Tokyo, Japan, is bringing out the next issue of 'Anjali' in October, 2009. This issue, I am sure, will be informative and useful.

I wish the publication all success.


(Buddhadeb Bhattacharjee)



AMBASSADOR

भारत का राजदूतावास, टोकियो
EMBASSY OF INDIA

2-11, Kundan Minami 2-chome
Chiyoda-ku, TOKYO 102-0074
Tel: (81-3) 3265-5036 / 3512-2125
Fax : (81-3) 3262-2301
E-Mail: amb@indembjp.org

20 August 2009

Message

I am happy to learn that Durga Puja is being celebrated in Tokyo by the Indian community on 3 October, 2009.

Durga Puja celebrates the triumph of good over evil, a yearning that is familiar to all Indians and an occasion for them to come together and celebrate. As the Indian community grows in Japan, events of this nature will help strengthen its spiritual bonds with the motherland.

An increasing number of our Japanese friends have also been participating in these annual Durga Puja celebrations, a sign of the deepening friendship and mutual understanding between our peoples.

I appreciate the efforts undertaken by the Organizing Committee to celebrate Durga Puja and extend my warm greetings to all members of the Indian community on this joyous occasion.

H. K. Singh
(H. K. Singh)

সম্পাদকীয়

পরিবর্তনই হোল সৃষ্টিরহস্যের একমাত্র শাস্ত্রত সত্য , এবং তার প্রকৃত রূপ । আর এই পরিবর্তনের মধ্যেই রয়েছে বিবর্তনের উৎস । সৃষ্টি , স্থিতি , বিনাশের এক অন্তহীন আবর্তের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয় বিবর্তনের ইতিহাস ।

যে কোনও স্থিতাবস্থা বিদ্বিত হয় পরিবর্তনের ধাক্কায় । কখনও সেই পরিবর্তন প্রগতির প্রয়োজনে বহুলাংশে আকাঙ্ক্ষিত , কখনও বা পরিবর্তন কুটিল স্বার্থে জর্জরিত অস্থিতাবস্থার চরম প্রকাশ । যে পরিবর্তন বয়ে আনে সুযোগ সুবিধা আনন্দ , মানুষ তাকে আলিঙ্গন করে নির্দিধায় । আবার সেই পরিবর্তন যদি দুঃখ কষ্ট অশান্তির বাহক হয় , তাহলে তাকে সহজে মেনে নিতে চায় না মন । পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পাই বদলে গেছে অনেক কিছু । তার মধ্যে বিগত কয়েক বছরেই অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে মানুষের ।

আমেরিকার মত উন্নত এবং ধনী দেশের সাধারণ নাগরিকরাও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল সে দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় । যে ব্যবস্থা দেশের জনসাধারণকে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে , সেই ব্যবস্থার প্রতি মানুষ কিভাবে রাখতে পারে তার আস্থা ? তাই সার্বিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসাধারণের বিপুল সমর্থনে জয়ী হয়ে রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতায় এসেছেন মার্কিন ইতিহাসের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি -- ওবামা । আমেরিকা তথা সারা বিশ্বের মানুষ আজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কবে আসবে রাষ্ট্রপতি ওবামার সেই প্রতিশ্রুত পরিবর্তন । জাপানেও যে দলটি অর্ধশতাব্দীর উপর প্রায় একটানা ক্ষমতায় ছিল , হঠাৎ আজ তারা ক্ষমতা হারিয়েছে । তবে কি বীতশ্রদ্ধ জনসাধারণ সেখানেও চায় পরিবর্তন ?

সারা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির যে পতন , তা অর্থনৈতিক মন্দারই এক ভয়ঙ্কর বহির্প্রকাশ । এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি কি শুধুই ঘটনাচক্রের ফলাফল , নাকি বিকৃত স্বার্থের কুটিল প্রভাব ? পরিবেশ দূষণের প্রভাবে ভবিষ্যত প্রজন্মকে কতখানি দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হবে , সেই দুঃশিস্তায় আজ সারা বিশ্ব সরব হয়ে উঠেছে ।

একইভাবে পরিবর্তনের প্রয়োজন এসেছে বা প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে মানুষের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা এবং ধর্মচেতনায় । দিগ্ভ্রান্ত সাধারণ মানুষ বোঝেনা এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির শেষ কোথায় । নিজের জীবদ্দশায় দেখে যেতে চায় ‘পরিবর্তন’ । কেউ বা এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে যুক্তিতর্কের মাঝে , কেউ বা শরণাপন্ন হয়ে ঈশ্বরের । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে ---

‘অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে ।
অমৃতভবন কোথা আছে কে জানে ॥
হেরো আপন হৃদয় মাঝে ডুবিয়ে , একি শোভা ।
অমৃতময় দেবতা সতত
বিরাজে এই মন্দিরে , এই সুধা নিকেতনে ॥ ’

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যদি সজাগ থাকে তাহলে ঘটনা প্রবাহে উদ্ভূত বিবিধ সমস্যার মধ্যে খুঁজে পাবে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের । ইতিহাসের পাতায় যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে তার আর পরিবর্তন করা সম্ভব না হলেও ভবিষ্যতে যে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটবে আজ তার শুভারম্ভ হতেই পারে ।

এবারকার অঞ্জলিতে সাম্প্রতিককালের বহুল আলোচিত বিষয় ‘পরিবর্তন’ নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে । এছাড়া রয়েছে অন্যান্যবারের মত বাংলা , ইংরেজী , হিন্দী এবং জাপানীতে রচিত গল্প , কবিতা , রম্যরচনা , ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদির বিপুল সম্ভার ।

জগৎজননীর কাছে প্রার্থনা জানাই সকলের জীবনে ‘পরিবর্তন’ নিয়ে আসুক সার্বিক মঙ্গল --

সমস্তা লোকাঃ সুখিনো ভবন্তু ॥

Editorial

Whether perceived as a mystery or a manifest entity, creation is a concept that is deeply rooted in our acknowledgement of what we call change, an eternal truth that is the fountainhead of evolution. And all that evolves follows the endless cycle of Creation, Preservation, and Destruction. Whatever appears as stable and infallible is susceptible to change. Humanity desires such changes as to initiate and sustain progress, but oftentimes they trigger instability, serving evil interests. We happily embrace changes that promise peace and prosperity, but try to stay away from those that portend only pain and hardship. A mere glance backwards would reveal the immensity of the changes over ages including those that we continue to accept as epoch-making even in our times. Affluent societies such as even in the US reveal discontent among masses with the existing social and political order. How can a government expect unflinching trust if it fails to ensure men in the street the basic necessities of life? No wonder Barack Obama, the first African-American US president emerged victorious with the support of the common people and is at the helm of the government today: he promised a plan for a comprehensive change. Not only Americans but people all over the world are eagerly waiting for the changes envisaged and promised by him. The political party which ruled Japan almost without a break for more than five decades suddenly lost its grip on power. Is it that the citizens of the country also want some real change? Recent crash of the financial institutions around the world is just an outward manifestation of a severe economic meltdown. Is this unwanted situation merely a result of some stray events, or were there evil interests playing a bigger role in it? The whole world has now turned vocal in expressing anxieties about the extent of misfortune that environmental pollution may impose on the future generations. In a similar way, a new wave of changes is either appearing or need for it is being felt in respect of cultural and religious consciousness. Common people, bewildered, have no idea where this unnatural phenomenon will lead them to. They ardently hope things will change in their own lifetime. Some people seek a logical explanation to the events of our times, and some others resort to prayers. I feel like quoting Tagore here:

The Universe drifts along on the endless sea of time,
Who knows where the abode of eternal bliss is,
Perceive your own self deep within,
Observe it in all its breathtaking beauty!
God who is the source of endless bliss is always present
Here in this temple, in this home assuring everlasting happiness.

If the conscientious rightly weigh happenings all around, one may find, even amidst the apparent problems that are surfacing in the streams of events, the path leading to a bright future. It may not be possible to change the course already laid out in history; however one may be able to set off on the right track today and advance towards a promising future.

In this year's Anjali, "Change" has been discussed from different perspectives. In addition to this, like in the other years we have also a sizeable collection of stories, poems, featured articles, travelogue etc. in Bengali, English, Hindi, and Japanese to entertain our readers..

We end with an earnest prayer to our Mother Goddess to bless all of us for brighter days ahead.



Acknowledgements

We are pleased to offer our annual publication of Anjali on this auspicious occasion of Durga Puja celebration. It is the God's grace that we could prepare this year's Anjali also with utmost dedication and devotion. Over the years, this has become a project so big that without support from many people it would not be possible to successfully complete this project. We would like to thank all of them who have helped us in this effort.

The Embassy of India in Tokyo extended their gracious support for which we are very thankful. We hope to receive the same patronage in future as well. We would like to thank all advertisers who have sponsored this year's publication. We thank Syamal Kar and Arijit Basu to maintain an ongoing strong relationship with all our sponsors. Every year Anjali is being enriched by the valuable contributions from native speakers of different languages and various cultural backgrounds. We sincerely thank each of them for their valuable support. We thank Karabi Mukherjee, Bhaswati Ghosh, and Viswa Ghosh, who helped us in proof reading. Sandipon Saha continued his help in compiling advertisements. We thank him very much. We also thank Shobi Insatsu for printing Anjali.

Nishant, Tannistha and Rupkatha had to bear with us while we were engrossed in Anjali's preparation. Their cooperation is highly appreciated. At different stages of this process, we received valuable advices from many well wishers. We tried to incorporate their suggestions as much as possible. We convey our sincere thanks to all of them.

Editorial Team

Editorial Team

Ranjan Gupta
Ruma Gupta
Sanjib Chanda
Meeta Chanda
Sudipta Roy Chowdhury
Indranil Roy Chowdhury
Sudeb Chattopadhyay
Keiko Chattopadhyay

Illustrator

Meeta Chanda
Sudipta Roy Chowdhury
Kaori Iwai
Arnab Gupta

Cover Design

Indranil Roy Chowdhury
Sanjib Chanda

Integration & Theme Page Design

Sanjib Chanda

Contents

Special Theme - Change

Fundamentalism or Universalism? – Swami Medhasananda	10
Durga Pujo and its changing traditions – Sudeb Chattopadhyay	16
Change - or is it Evolution? – Hemalatha Anand	19
Financial Crises - A Historical Perspective – Raju Alluri	20
Is There A Coming Transformation? – Udit Ghosh & Viswa Ghosh	24
Life Style Change Plus towards Sustainable Society – Anindya Bhattacharya	29

Story, Travelogue, Feature, Poetry

পরিবর্তন - কয়েক টুকরো স্মৃতি, কিছু উপলব্ধি – কল্যাণ দাশগুপ্ত	32
জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে – শুভা কোকুবো চক্রবর্তী	35
প্রবাসের চিঠি – মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত)	36
খুঁজে মোর গাড়ীর চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে – ভাস্বতী ঘোষ (সেনগুপ্ত)	38
কেই – তানিয়া রায় ভট্টাচার্য	39
বালিশ – সুপর্ণা বসু	43
জাপানে ক্ষুদ্রদার দুর্গা দর্শন – অনুপম গুপ্ত	45
খাদ্যের অভিজ্ঞতা – চন্দনা মুখার্জী	47
পিরামিডের আশেপাশে কয়েকটি দিন – ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী	48
রিকশায় চড়ে যাই হাসনাহেনা দেখতে – কাজুহিরো ওয়াতানাবে	52
শিতামাচি – রুমা গুপ্ত	54
অনাবাসীর আবাসপ্রাপ্তি ও আনুষঙ্গিক উপসর্গ – শংকর বসু	59
শ্রী সাবুরো মাশিনোর জীবন-চিত্র – মাসাইয়ুকি উসুদা	60
আক্ষেপ – সুদীপ্তা রায়চৌধুরী	63
আমার মা – রেখা ভট্টাচার্য	64
মন – নমিতা চন্দ	65
প্রতীক্ষা – অজিত কুমার পাল	65
India Calling – Sougata Mallik	66
A Trip to Yosemite National Park – Arup Bose	68
At Different Ends of the Sea – Sumon Chattopadhyay	70
Seeing is Believing? – Prof. Tsuyoshi Nara	71
Grand Corridor Vision for Asian Economic Growth – R.Ramanujam	73
A Stroll down Ginza – Manmohan Sadana	75
The Mystery of 'Himba Digamma' – Tapan Das	77
Where the Mind is Without Fear – Udit Ghosh	79
Your Call – Jyotirmoy Ray	80
सूमो कुशती – गुर्जिन्दर सागू	81
बाली – मीता चन्दा	82
हिरोशिमा की याद – सुरेश ऋतुपर्ण	85
माँ को अर्पण – मोहन चुटानी	86
लटकती तलवारें – सुनील शर्मा	86
अकेला – माधुरी बुडाली	87
「わっこひろば 宙そら」へ向けて 子育てアドバイザー 山田 さくら	88
インド人と結婚したマカオ人の私 (結婚式編) クリスティン・バナジ	89
赤ちゃんの成長を祝い・・・こんな事してみました！ サーカー 美紀	90
インドの踊り チャンドリー・ガングリ	92
ベンガル語と日本語のポライトネス ラキット工藤昭子	95
2009年コルカタの夏 Summer in Kolkata, 2009 吉田 美紀 Miki Yoshida	100
Collection of Haiku Poems Compiled by Venkatachalam.M	102

Pujo Ananda	103
Chutir Moja	104
Young budding stars Section:	
New Arrivals	105
My Dubai Trip – Sneha Kundu, Grade I	106
Aliens – Nishant Chanda, Grade III	107
The Thief – Arunansu Patra, Grade IV	109
Healthy Eating For Kids – Aishwarya Kumar, Grade IV	109
Archery Tournament – Amartya Mukherjee, Grade V	110
Basketball – Shreya Das, Grade V	111
The Amazing Great Wall of China – Aratrika Pan, Grade VII	112
Trouble in Baffin Island – Tannistha Roychoudhury, Grade VII	114
Cheetahs – Monalisa Das, Grade VII	117
51 – Ricky Dasdeb, Grade IX	119
Instruments to Macbeth's Downfall – Shalini Mallik, Grade XI	122
TV Sensationalism – Justified? – Shoubhik Pal, Grade XII	124
The Red Sari – Reimi Dasdeb, Grade XII	125
Drawings	
“Rainbow” by Ron (4 years)	126
“Divine Touch” by Kenta/Sumit Bhowmik (Grade I)	126
“Candle” by Aryan Sharma (6 years)	126
“Sunrise” by Tuhin Nag (Grade II)	126
“Nature's Beauty” by Mritywikta Dutttagupta (Grade I)	127
“Fruits” by Akaash Dutttagupta (Grade VI)	127
“Air Force” by Aneek Nag (Grade V)	127
“Inspiration” by Subhankar Vakde (Grade II)	128
“Pokemon Card” by Arpan Bose (Grade II)	128
“Scarlet Macaw” by Arsh Bhole (Grade III)	128
“Ganesha” by Kavya Sharma (Grade IV)	128
“My Garden” by Utsa Bose (Grade IV)	129
Painting by Shreyashi Bhattacharya (Grade IX)	129
Arts	
“Genkan (Entrance)” by Sanchita Ghosh	130
“Sky is the Limit” by Sushmita Pal	130
“Rammandir Market” by Jyotirmoy Ray	131
“Lost in Thoughts” by Mimi Dhar	131
Photographs	
“Ze-Man” by Santanu Nag	132
“A Solitary Man in Hiroshima” by Ahona Gupta	132
“Boring? NO, Tired? Yes.” by Sanjib Chanda	132
Indian and Japanese Foods & Festivals	
Cook the Traditional Way – Nandini Basu; 訳文 ステブ & 啓子・チャットパダイ	133
十五夜のお供え物・月見団子 啓子チャットパダイ; English Translation: Sumon Chattopadhyay	136
Some Major Hindu Festivals – Sudipta Roychoudhury; 訳文 ステブ & 啓子・チャットパダイ	140
日本の行事 啓子チャットパダイ; English Translation: Meeta Chanda	145
Statement of Accounts	
Special Thanks	



అపారాధ

IrREGuLArITy

MOMENTUM

TURBULENCE

CONFLICT

CONFLICT

CONFLICT

GROWTH

DECAY

Fundamentalism or Universalism?

Swami Medhasananda

February 2008 issue of the newsletter of the Vedanta Society of Southern California, Hollywood published a report of special significance for those interested in interfaith dialogue. The report told of an interfaith conference held in Los Angeles and attended by followers and clerics from several faiths, including Hinduism, in which Rt. Reverend J. Jon Bruno, Bishop of the Episcopal Diocese of Los Angeles, issued the following statement:

"I believe that the world cannot afford for us to repeat the errors of our past, in which we sought to dominate rather than to serve. In this spirit, and in order to take another step in building trust between our two great religious traditions (Christian and Hindu), I offer a sincere apology to the Hindu religious community."

The Bishop also said he was committed to renouncing "proselytizing" of Hindus.

This statement from a Christian priest was so entirely unlike the longheld position of the Christian churches regarding its relationship to other religions, including Hindus, that it left the audience somewhat stunned. Now, the fact that these remarks are not just the expressed feelings of a solitary Christian priest from California has been corroborated by another significant speech made by a prominent Catholic priest of high stature very recently. Bishop Kazuhiro Mori of Tokyo was one of three guest speakers who graciously accepted an invitation to give a talk on 'Selfless Service' before an elite audience at the Indian Embassy auditorium on the occasion of the opening ceremony of the Golden Jubilee of the Vedanta Society of Japan on June 14, 2009. The other speakers represented Vedanta and Buddhism.¹

In his opening remarks Bishop Mori said, "... when I look back on the past, I wonder if the Catholic Church had a right to face the common man and speak of neighbourly love..."

"To the casual observer it appears as though the Catholic Church is actively involved in serving the poor and the oppressed. Yet, the intentions behind such service were not always pure. In certain extreme cases ulterior motives such as seeking to change the other person's religion were at work, and at time a condescending attitude was adopted towards the people they were trying to save."

"On observing the history of the Catholic Church, we see that often in the past it adopted the attitude that its own teachings alone were absolutely true and it meted out harsh punishments to those who followed religions or beliefs different from its own, often even resorting to violence. In the name of God it expelled such people from society, and deprived them of their lives. This is a history we cannot deny."

And later he said, "We should approach them (those in need) with due respect for the religion and beliefs that they have so deeply cherished all along. We should accept them for what they are, in an attitude of genuine sincerity. Yet, sad to say, such an attitude is rarely seen in the service-oriented works of the Catholic Church."

Those who heard Bishop Mori's words felt they were straight from the heart and not motivated by any desire to stir up controversy for audience appeal. Nor did he seem concerned about how such comments would be received by his colleagues or his organization.

The two speeches noted show a changing mindset from at least some of the leadership of a proselytizing religion which was always a source of dissension between two religious communities in a country like India, namely, Christians and Hindus.

Nevertheless, it becomes evident from a study of the recent history of the Catholic Church, the single largest sect in the world to the present day, that in the Christian ecumenical movement there is unease between the mission to make the world a

'Christian world' and its urge to engage in serious and effective interfaith dialogue.²

When we look back we see that the first concrete step towards the harmony of the world's religions was inaugurated at the historical Parliament of Religions in Chicago on September 11, 1893 as part of the World's Columbian Exposition, also known as the Chicago World's Fair. In his historic speech at this conference Swami Vivekananda, representing Hinduism, expressed his fervent hope saying, "The bell that tolled this morning in honour of this convention may be the death bell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all charitable feeling between persons wending their way to the same goal."³

Unfortunately later events, namely dissensions among Hindus and Muslims, Jews and Muslims, Muslims and Christians, and recurring infighting between sects of these religions, including Buddhism, show that the hopes of Vivekananda are far from being realized. It is true that some inter-religious conferences have been held in the aftermath of that first Parliament of Religions by such organizations as International Association for Religious Freedom (IARF), World Congress of Faiths, The World Conference on Religion and Peace, and the Temple of Understanding and all are working towards harmony of religions, or in other words *religious pluralism*, but the impact has not been significant as yet.

The reason for this lack of impact is that most of these conferences pass some pious resolutions at the end of lofty deliberations, but no real attempt at meaningful follow-up is made - especially any effort to bring the common members of two communities nearer.

It is an irony that September 11, the day of the inauguration of the world first Parliament of Religions, would be the date in 2001 for a daring terrorist attack on New York's World Trade Center. Up to that time although countries like India had suffered tremendously owing to senseless acts of terrorism, big powers like the United States and Britain did not care to ponder the problem until they too had become victims.

Terrorism as practiced today has originated

from multiple complex factors, but no doubt a lack of harmony and a lack of familiarity and understanding among the leaders and followers of different religions have paved the way. What is worse, some religious groups and centres actively and openly preach violence and hatred against other communities instead of preaching love and peace and are breeding grounds of terrorism.

While one reaction to nine-eleven would be the branding of an entire nation or nations as evil and to launch wars of revenge violating all norms of justice and equity, another more positive approach would be the initiation of a serious endeavour to understand the ideas and practices of other religious communities. It is being keenly felt that apathy and self-complacency must make room for a genuine interest in knowing and interacting with other communities.

As far as the Muslims are concerned most of them and their leaders had been insensitive when terrorists, many of whom were Muslims by faith, killed Hindus and followers of other faiths. Since Muslims also were becoming victims to the indiscriminate terrorist attacks and there is tremendous pressure of the world opinion against it Muslim leaders are now distancing themselves from such terrorists.

Another noticeable change in the religious scenario as we see it today is that people are increasingly becoming less interested in organized religions - religions with set doctrines, set modes of worship, set places of worship and set codes of conduct for its followers. This is especially happening in the West. Numbers of churchgoers are decreasing so much so that some church authorities are having difficulty maintaining their huge properties and are forced to either sell off portions or rent space for secular activities. When the present author visited Europe in 1996 he saw one such church that had been purchased by a Hindu religious group!

Lack of interest in organized religions started with the dawn of the age of reason in place of faith, when science became so powerful as to challenge the very basis and rationale of religion. Any rational or scientific mind would hesitate to accept many of the things most organized religions advocate, the most important and common of which is to believe

without question. Initially a compromise between faith and reason, the practice of religion and science was attempted by splitting one's personality into one of faith with weekly visits to the church and immediately switch to a mind of reason once out the door.

But for many this was neither comfortable nor acceptable, hence they preferred to distance themselves from the church. This accounts for the decrease in the numbers of church goers. When the author visited Italy in 2006 and stayed at the headquarters monastery of the Camillians, a Catholic Order in Rome, he had a chance to interact with some of the resident monks and priests. A dialogue with them revealed that at the training center designed to accommodate some 60 novitiates, no more than three or four had joined for training.

This situation has led to two developments which will be explained now.

Some people are searching for a religion that can satisfy both their rationality and religious sentiment. Religions like Hinduism and its offshoot Buddhism combine rationalism and the spirit of enquiry with faith and sentiment and are thus increasingly appealing to modern minds. These two religions transcend reasoning but do not contradict it and can accommodate devotees bent on faith and also those bent on reasoning. This is why people especially in the West attend en masse when illustrious Hindu or Buddhist religious leaders give discourses.

Some of the spiritual programmes like Hindu guided meditations or Buddhist Vipasana meditations, which are not generally offered by other religious groups and churches, also attract substantial number of attendees. These people feel such sessions can be of real help in making their lives more stress and tension-free bringing them some mental peace and a comfortable feeling. Hundreds of CD on meditation advertised through internet also point to this fact. Again, the practice of the concept of harmony of religions, by honouring the prophets of other religions through some ceremony in addition to their own, is a chief characteristic of Hindu groups such as the Vedanta Societies worldwide. This deeply impresses those living in foreign countries like Japan who are critical of the narrowness of many religious groups that say theirs

is the only 'true' religion, theirs is the only true *prophet* or the only *true* God and others are not, as Bishop Mori has already pointed out. Extreme form of such exclusiveness is better known as religious fundamentalism.

This situation has impacted some Christian sects in some most interesting ways in recent years. Some are setting apart a room for contemplation in their churches; have initiated *yoga* classes for their devotees; and have even begun calling their center an *ashram* in one case. The most prominent of these sects is the Christian group better known as the "Desert Fathers".

Another noticeable change quite evident over the past few decades is the number of people who reject religion and belief in God outright and refuse to visit any religious center or leader or attend any religious ceremony. There are top selling books ridiculing the very concept of a God or an afterlife of heaven or hell. Yet they are still seriously searching for the meaning and purpose of life; trying to understand the idea of karma and its effects; trying to solve the mystery of life and death, rebirth, liberation, while tormented by the deeper questions like "Who am I?" and "What is my real Nature?" and "How am I connected with others? What happens to me after death? Do I totally perish or does something of me remain to continue the journey after death?" They want to solve these types of serious questions about life. Such people want to get answers and study spiritual and philosophical books and magazines and explore the Internet. Thus, they are also spiritual seekers, if not religious in the conventional sense.

According to a survey published recently by the Institute of Statistical Mathematics of Japan in the Daily Yomiuri (newspaper) on July 18, 2009 stated that more than 60% of people in their 20s and 30s feel frustrated in life because of family or workplace related problems and economic sluggishness, and they are trying to find an emotional anchor to combat a sense of helplessness. Another survey taken in the USA asked recent university graduates and new employees were asked if they had received any training, whether at home or at school, to successfully face the problems of life like failure, frustration, tension, stress, etc. This survey revealed that most felt they had received no such training.

Japan is not alone with its young generations searching for emotional support, or the USA where their young feel no form of education is imparted to help in successfully facing the realities of life. No, this is becoming a global feature, especially in cities in recent years.

Life is not a bed of roses: desires are not always fulfilled; success is not guaranteed; physical ailments are common; relationships have their ups and downs; and work related problems are commonplace too. Unless people are equipped with the training necessary to deal with the vicissitudes of life that are so much harder than the mere passing of school exams; unless they are provided with emotional support when they find themselves helpless and vulnerable many fall victim to psychological problems and suffer badly. Some resort to pastimes and recreations that offer only momentary relief, but the best emotional support one can find is through religion, the training of which should start early for best results.

While bringing up their children parents should actively guide and equip them to face the realities of life. Even at the youngest ages children face moral and spiritual dilemmas that parents should discuss rather than try to avoid or suppress. It is said *catch them young* and children should be encouraged to offer short prayers, to practice some simple meditation, and to read biographies of prophets and moral and religious stories.

It is also imperative to teach them that while they follow their traditional religions they should also show respect to other religions and their gods, scriptures, prophets, places of worship and rituals. It should be impressed upon them that though sun is called differently in different countries there is no difference in the sun that rises in India or Japan; similarly, though God is called differently in different religions God of the Hindus or Muslims or Christians are not different but the same God. This type of spiritual education will go a long way in bringing religious harmony and would definitely help children morally, psychologically and spiritually.

It is wrong to think that devoting time even to some simple religious practices would hamper the children's studies. This argument is untenable; rather it is quite the opposite. To give an example, while it is compulsory for students of Ramakrishna

Mission schools or colleges who live in the dormitories to attend evening and morning prayers, it is also well-known that these are the students that consistently achieve spectacular results on their public examinations.

Books like *Spiritual Parenting* available in the market is also helpful in guiding children in matter of religious practice.

Parents spend a lot of money to send their kids to piano teachers and sports clubs and extracurricular studies on subjects they may have under-achieved in or not been properly exposed to for better, all-round educational development. But the most vital thing for such an all-round, holistic development is this moral and spiritual training, as the spirit or soul is the substratum of our personality - the co-ordinator of various levels of our body-mind-ego complex. To bring up a child without giving him some sort of inner training is like worshipping a beautiful image of God without first performing the ritual of *Pranaprastha*, that is, invoking life into it.

Children also should be tutored about the features of a genuine religion or religious leader, for example love not hatred, openness not secretiveness, purity not hedonism, freedom not coerciveness. This is most important because of the rise of various cults like *Om Shrikyo* of Japan of the recent past and cults with dangerous ideas and practices which are sometimes visited by simple hearted boys and girls in search of some sort of emotional support, who later fall into great trouble because they cannot distinguish between a genuine group and a delusive one.

We have discussed above some important changes and their impact in the religious scenario of the world and also discussed how we can remedy some of the harmful consequences of such change.

Discussion of changes in any given field in the past becomes relevant and significant only when it is considered in the backdrop of the present and future. Our previous discussion sets the stage for our discussion about our vision for the future, for the twenty-first century, for the third millennium in the field of religion. Such vision should be to establish a genuine and effective harmony among different religions and religious sects. Such harmony

is important not only for different religious communities, but also important for a family, for a society, for a country, for the whole world, not only in the field of religion but also in the fields of society, culture and politics.

We are being compelled more and more to live with people of different temperaments and families of different social, religious, cultural, political and even racial backgrounds. The necessity of such mutual understanding and harmony among these various segments of society is more keenly felt now than it was over a century ago when the first Parliament of Religions was held. "Many western countries, including the United States and Canada, are in the midst of a new multicultural and multi-religious reality. All over the world, the political, religious, ethnic, cultural and racial identity has led to a new period of turbulence." ⁴

This development, with its beginnings in the Modern Age after the Industrial Revolution and the consequential search for markets, Western Colonialism and political, religious and racial persecution in Europe in the first half of the twentieth century became faster in the second half when immigration policies of some countries became more liberal and people began emigrating for better careers, better living conditions and when globalization of economies has been taking place. For example, since around 1970 the religious landscape of the United States has changed radically in ways that are both visible and invisible. One such example are the substantial Asian minority populations of Japanese, Chinese, Korean, Filipino and other South Asians, including Indians, that have brought with them their religious and cultural traditions.

Physical proximity is bound to cause conflict and tension unless there is a sort of mental proximity as well and here lies the main cause of various conflicts at different levels and in different fields at present. Mental nearness presupposes the idea of mutual acceptance, which is deeper than mere tolerance. But such mental nearness through an emphasis on mutual acceptance, emphasis on those points of agreement not disagreement, does not occur ipso facto, but needs a sort of understanding and orientation of all concerned based on a concept which should also be pragmatic.

Materialisation of this concept, which may be called the concept of harmony or the philosophy of harmony, is the crying need of today.

When Dr. Jagadish Chandra Bose, the famous Indian Scientist of the last century, created a sensation by demonstrating the even plants can feel joy and sorrow Swami Brahmanandaji, a monastic disciple of Sri Ramakrishna and realized soul of the highest order, made a significant remark after observing one of Dr. Bose's demonstrations. He said, "Professor Bose, I am looking forward to that day when you will demonstrate, as the present one, that stone also has life."

For many centuries scientists made a distinction between matter and spirit, sentient and insentient, and also argued that spirit, better described as consciousness, is produced by matter. While Indian sages declared long before that the Supreme Reality or Consciousness at the macro level, which is omnipresent and pervades everything, everywhere, every being, is not only in the sentient but also in the so-called insentient. The difference is only in the degree of manifestation of consciousness; while in a stone it is latent, in an amoeba or plant it is less, but in a fish it is greater, in an animal being it is more, and in the human being we see the greatest manifestation of consciousness in comparison with other preceding species.

This is symbolically told in a Hindu mythological story in which the demon king Hiranyakashipu, a hater of Lord Vishnu, asked his son Prahlada, a great devotee of the Lord, "Does your Vishnu live in this column of the palace?" Prahlada unhesitatingly replied, "Yes, He does." To verify this answer Hiranyakashipu hit the column with his mace when the Lord appeared and killed him.

When Sri Ramakrishna, the God-man of Modern India, had the vision of the Divine Mother Kali while acting as a priest in the temple at Dakshineswar, near Kolkata, he saw not only the stone image of the deity as consciousness, but also the Puja articles, the doors, the floors of the shrine, everything around him as consciousness. Owing to the same experience he could not pluck blades of grass for worship as it would hurt the consciousness in the grass. Swami Vivekananda, the chief disciple of Sri Ramakrishna and preacher and

exponent of His message, had the same experience of all pervading consciousness as a result of Sri Ramakrishna's divine touch. He felt that everything is made of consciousness; the cars in the roads, the people in the streets, the iron fence railing around the park near his house, the rice in the plate, the plate itself, his mother serving the meal to him were all made of consciousness - that is God.

The latest studies of consciousness by both scientists and philosophers also point to the truth already revealed by Indian sages that there is no real distinction between matter and spirit, in fact, everything is spirit. In this context, Lord Balfour, a famous scientist made the following significant remark: Modern materialism has progressed so much that it has ceased to be materialism.

It is through this consciousness, which conventional religions call God and whom Sri Ramakrishna would call Kali, every entity of not only the world but of the whole universe, is interconnected. Thus we human beings, of all countries, of all races, and all animal beings and trees and plants, every phenomenon of nature are all interconnected. How suggestively this truth has been presented in the following expression: No man is an island! This is how we can find unity in diversity and can establish harmony with everyone and everything. This is what we may call the law of harmony, the philosophy of harmony, which emphasizes unity, yet makes room for diversity. Thus not only do we tolerate others, we accept others as they are, as Swami Vivekananda would always advocate.⁵

Compared with this spiritual bond other bonds of harmony and mutual relationship namely political, linguistic, racial, religious (i.e. I am a Buddhist, I am a Christian) or even the broadest views of humanists, are narrow, shallow and fragile.

If we want to establish a genuine and effective harmony in this world, we have to understand this concept of our interconnectedness through consciousness, or the *Self*, or God, or whatever you may call it, feel it, emphasize and practice it in every sphere of our relationships, be it with other human beings or animal beings or even a plant. Thus identifications with others will become easy and natural and consequently, mutual love, acceptance and co-operation will follow; peace will follow; and a new age envisioned by all great men of the world will usher in on this strife and schism ridden planet. ☺

Notes and references

1. For full report of the Celebration and text of speeches please see *newsletter of the Society* for August, September, and October 2009 (vedanta.jp).
2. Foreword - Diana Eck: *The Dawn of Religious Pluralism*, Ed. by Richard Hughes Seager, Open Court, La Salle, Illinois, 1993
3. Chicago Address - Swami Vivekananda p.21, Advaita Ashrama, Calcutta, 1993
4. Ibid - Diana Eck
5. Similar ideas have been expressed by Swami Vivekananda in his numerous talks. Please see *Complete Works of Swami Vivekananda* published by the Advaita Ashrama.

Durga Pujo and its changing traditions

Sudeb Chattopadhyay

Autumn is in the air, time for Durga pujo, the much-awaited grand festival for all Bengalis, not just in India but for all the sons and daughters of Bengal scattered all over the world. The occasion here for me is to give words to my thoughts on the changes I observe in the celebration of the Durga pujo these days. The opinion stated here is very much my personal reading on the theme, and does not in any way represent the collective opinion of the BATJ community in Tokyo.



old-fashioned *para* community. One chief contributor to this trend is the proliferation of housing complexes in and around Kolkata. And thanks to the affluence of the members of these communities who have chosen to live in these high-rises the budget for the pujo has sky rocketed. Where the old community organizers were to make ends meet with budgets of the order of thousands rupees, now most of such housing society complex pujos have budgets of the order of lakhs (one lakh=100,000), some approaching a crore (ten

millions), as the gossip goes.

Now is that extravagance in the name of Durga pujo? May be, may be not. If you think of the original idea behind Durga pujo is to pray for the well being of the community as a whole on this once-a-year occasion, it seems too much. But on the other hand if you look at it from an economic value chain perspective, this spending or consumption however unwarranted it may look, given the worldwide economic slump, may make some sense, albeit as a small contribution to the domestic growth that is so much more important these days.

Creative explosion

I grew up knowing that pujo pandals are made of strong and stout bamboo sticks used in the key scaffolding-like structure, the overall top cover need to be tarpaulin to protect against unannounced rains, and most of the intricate decorations inside to be made of colorful clothes specially dyed for the occasion. The *protima* itself to be made of *khar* (straw) and *mati* (clay) by expert artists of Kumartuli, and can be also made of *shola* (cork) to make it light if the budget can afford it. Your creativity was almost limited by the materials the norm dictated. The attractiveness of the various community pujo pandals

The high-rise effect

Preparation for the community pujo is in full swing. Selection of the key officials of the pujo organizing committee is complete, now is the time for the constant argument and planning on how to tackle the most difficult *chanda* (money collected for organizing the pujo) contributor, approach notable persons for sponsors as they have broad connections to the business people and by virtue of that more influence on the prospective advertisers, plan for publishing the booklet mainly for the advisers making sure that they consider contributing again next year, and so goes the long list of things to tackle. The greatest headache is how to keep everyone concerned happy with every little detail in spite of the tiny budget. At least, this was the scene back then, say, about fifty years ago.

How much of that has changed today? Ask any long time Kolkata resident, and he or she will reveal the philosophical, at times satirical feelings about the change. Not that we do not spend any less time for preparations compared to what we used to back then, one that stands out these days is the sheer increase in numbers of community pujos. Not to say that these have sprouted at the expense of the small budget *baroari* pujos centered around the so-called

and *protima* was decided based on the beauty of the *protima*, face to be precise, and the surrounding decorations including the inside of the pandal. At night when most visitors came to appreciate and judge the creativity of the organizers, the atmosphere was carefully accented by the lighting decorations both on the approach alleys and also right inside and outside of the main pandal. The atmosphere was almost always made more festive through deft use of music and occasional showmanship of the *dhakis*, the captivating rhythms weaved with their intricate drumbeats accompanying the *dhunuchi* (incense-pot) dance.



The overall approach has not changed, but the artistic expression seems not to have any bounds of the so called old-fashioned norm these days. We now do not hesitate to walk in to, say an Egyptian cave carefully replicated with all things specific to that country and history only to find that our beloved Durga has a befitting place to be worshipped even in such a surrounding. Here creativity knows no bounds, as it should be anyway. And it seems that we are growing used to seeing the most unexpected scenarios and surroundings to worship the deity, brainchild of handsomely paid famous modern artists. Devi Durga appears to have appropriately bestowed her blessings to nurture this creative explosion of ideas, and as you have already surmised, this has only been made possible by the deep pockets of the organizers these days. No longer is the focus on how to create an atmosphere for the solemn purpose of worship, now it is more an expression of artistic showmanship befitting the entertainment industry.

Through the kids' eyes

Almost fifty years ago when I was a kid, we eagerly waited for the long vacation. That has not changed much even for the kids today. I still vividly remember the emotional thrill of waking up in the early hours of *mahalaya* to the melodious prayer on *Akashbani*. The arrival of the much awaited celebrations, the daily early morning walk around the neighborhood to gather fresh flowers

for offering to the deity, the smell of fresh land-lily, the thrill of festivity in the air, the anticipation of getting decked in new clothes everyday on the four pujo days along with the inevitable anxiety about the inconvenience of no food and drink before *anjali* is offered both at the *baroari* pujo and then at home, made the whole experience repeated every year a priceless one.

Kids are not as fortunate today. Very few kids these days listen to the *mahalaya* program on the radio, this no longer is the rare occasion to hear the renowned artists perform the annual ritual. Cassettes and CDs are readily available, whenever one wants to. The program is still broadcast by *Akashbani*, but it mostly caters to the old nostalgic folks. The kids are more prone to appreciate the pomp and grandeur of the celebrations as their parents do, and somewhere in the process the emotional and spiritual feelings that we as kids had on the auspicious occasion has gone missing from the young minds today. May be this is the norm of the day. We cannot blame them to be so spiritually agnostic, it is just that the young generation is so overwhelmed with the overabundance of materialistic aspects of the celebrations their own parents so appreciate, that it is what they have become accustomed to grow up with and take for granted for the occasion.

The nostalgic mind

When I was a kid, Durga pujo was the time for prayer for the wishes you wanted to be granted, and you could do that only if you followed the strict rules for offering *anjali* to the goddess by practicing *nirjala uposh* (no food, no water). Most of the adults around us practiced the same custom, and the discomfort of not being able to taste the delicious food prepared for the occasion till the *anjali* ritual was properly completed, was a necessary inconvenience. Either you face the inconvenience without any complain, or the goddess is not going to grant your wishes. Things come true to only the one who trusts, that is. Taking a bath to cleanse the body, wearing a new set of clothes everyday before the prayer, prepare oneself for the solemn ritual with a clean body and mind, was almost synonymous to the occasion. The priests had the final say, and they followed the strict time guide for the pujo, and sometimes that meant that one would have to wait till all the pujo is completed and then the priest gets ready for conducting the *anjali*, which could go well into the

midday on occasions. No exceptions.

The practice seems to have changed. Organizers are much more business-savvy these days, pujo is just an occasion to make sure that we extend our best service of entertaining our customers, the people who will eventually flock to the pandals to offer prayers, and thereby generate the maximum collection of *pronami* (donations). The proper time based on old-fashioned *panjika* almost always never followed, especially in the more well-known community pujos. The priests are often requested to stop in the midst of their pujo, to facilitate offering of *anjali* whenever the customers see it to be convenient. You can now brag about where you went to offer your Anjali on the *mahashtami* day, and how impressed you were with the services the organizers extended to the right person at the right time and convenience.

Talking about enjoyment, back then a much awaited activity for us as kids was to go out with friends for an all night outing to check out the various community pujos, and appreciate the delicious *ghoogni* from the nearby food stalls. The people catering food at the stalls were mostly street vendors much like the yatai stalls in Japan. The hygienic condition under which the food was prepared was doubtful, but that did not deter us from enjoying the delicious food that everyone around seemed to relish. But this was never the main attraction of the pujo in our minds.

The situation has changed much on this front. As the focus on entertaining the customers has grown stronger, other businesses see this occasion as much-valued opportunity to do marketing for their products. As a result, gone are the impromptu street vendors, they have been unceremoniously replaced by big names in soft drinks, famous restaurants and the like. Often book stalls are part of the milieu as

well, catering to the intellectually curious folks. It is not limited to just foods, drinks and books. You should not be surprised to find other commodities on display in such stalls, for example, paints. The whole occasion, it appears, has become synonymous to a big mela in the pretext of worshipping goddess Durga.

Putting it all together

It seems that the spirit driving the pujo celebrations has hardly changed at least in the last fifty years. We spend as much energy and resources as we can accumulate in one year to organize a grand finale of festivities and expression of boundless community joy on this auspicious occasion. The tradition still continues. In some quarters, the old small community style *parar* pujos the age-old customs focused on the pujo itself still remain intact. But in the new quarters where status is determined by whether your efforts were worth enough for, say, an Asian Paints sponsored prize, where organizers pay more attention to decide anjali timings to maximize offers of *pronami* rather than strictly following the *panjika* prescribed proper time for the pujo and subsequent *anjali* to be offered, I think the spiritual and devotional aspects of the pujo is getting a back seat, and may be slowly and steadily passing into

oblivion. This trend will continue as long as the middle class population grows in number and its constituents continue to be willing to spend more money thanks to their well-earned affluence. And in consequence we will see the Durga Pujo being slowly transformed into a giant mela-type festival, a prime occasion to eat, drink, dance and be merry. If that happens, for the curious mind history books will become the main source to understand what the religious, devotional or spiritual aspects of Durga pujo really is. ❧



Change – or is it Evolution?

Hemalatha Anand

It's festive season, in India at least, and for all of us Indians it is a time to celebrate! There are festivals one after the other and be it Janmashtami, Ganesh Chaturthi or Durga Pooja, it is a wonderful opportunity for the Indian community here in Japan to get together and give our children a glimpse of our age old traditions and culture and get them to "feel" like an Indian once in a while!!

It's also a nostalgic time for many of my generation, who were born and brought up in India – a time when we are carried back to the "good old days" of when we would celebrate these festivals at "home" with all the religious fervor and fanfare. This year too, as always, I was reminiscing about my childhood days spent in Kolkata – about how much we looked forward to the 'Poojo'. It was a time to have fun. A time when the whole city would come alive with vibrant colour and excitement! I particularly remember how excited I used to be about getting several sets of new clothes for the occasion!

It was a very special thing back then- to wear new clothes! New clothes were almost always synonymous with special days and we would ogle for days at the shop window at the dress we wished we could have and our parents would make sure that we waited and yearned for it with all our heart before they actually bought it for us! That dress would then be our most valued possession-for the next few months at least!

In striking contrast, I look at my 7 year old daughter, who has a closet overflowing with clothes and to whom yet another new dress holds no excitement whatsoever. It almost seems like she is wearing it just to please me! On one hand it really saddened me to think of how times have changed. But on the other, I felt a little awed at how children these days are so unaffected by the material aspect of things. It also struck me how, at least my

generation almost entirely revolved around material possessions. Our lives were, and to a large extent still is, revolving around materialism.

What started as the yearning to possess that new Magnetic pencil box, a new dress, a Barbie doll has slowly grown to a new car, new jewelry, new house, and then to more jewelry, more cars, more clothes, more., more....

Without realizing, our needs have slowly grown into desires and developed into greed. Maybe we are not entirely to blame. Our circumstances were such. Our need was such. Our priorities were such. After all we cannot ask a starving man to fast!

Which brings me to think how easy circumstances are for our children. They have more exposure than we did and their parents have more affordability than our parents did. New clothes and toys are mere trivialities in their lives. They are ready to look beyond. And as parents, it is our duty to help them overcome what we couldn't –help them to see beyond want and greed, so that they can evolve into 'bigger' people than we are or could ever be.

It is not easy to give up material desires. It is, in fact the highest form of spiritual practice preached alike by all religions. Maybe we could never fathom this, but maybe our kids can! After all, it was a king who became the Buddha!

We need to create and show our children new avenues - get them to channelize their super brains and contribute positively to man and mankind.

They don't need to run the same rat-race that we did. They don't need to have the same upbringing as we did. In fact, they can't.

Times have changed. Circumstances have changed - and instead of us lamenting over the "good old days" and complaining about how unfeeling our kids are these days, it is time for us to come to terms with the fact that change is inevitable and our children are ready to look beyond - ready to evolve! ☺

Financial Crises – A Historical Perspective

Raju Alluri

The recent global financial crisis (GFC) of 2007-2009 has been called the worst financial crisis since the Great Depression in the 1930s. The crisis which started with the bursting of the housing bubble in the US around mid 2007 was initially dubbed the 'US Subprime Crisis' but quickly morphed in 2008 into a worldwide contagion that severely impacted economies across the globe. The effects of the financial crisis have included a severe contraction in the GDP of developed and emerging market countries, trillions of dollars in declines in consumer wealth and savings, billions of dollars of taxpayers money used to prop up banks and financial institutions and tens of millions of job losses.

How could this have happened? How could something that started with the defaults of subprime mortgages in the US have morphed into a global crisis? Who is responsible? How can we prevent this from happening again? These and other questions have been raised by the public which has been bewildered, frustrated and angered by the depth, duration, and global scale of this crisis. But before attempting to answer these questions, we need to ask ourselves – is this financial crisis really unique? Have there been similar financial crises in the past and what can we learn from them?

To get a better perspective on the causes and various solutions to fix the current global financial system, we first need to understand how modern banks, financial institutions and financial markets grew and evolved. And a study of financial history will reveal that the evolution of modern finance has not been a smooth upward ride. Indeed, speculative bubbles or booms and resulting busts and financial crises have been a recurring feature of financial history over the past 600 years. A study of these past developments and experiences can help shape our understanding of the current crisis.

The Birth of Banking and Financial Markets in Western Europe: From the 13th to 19th Century

Broadly speaking, the financial system plays an intermediary role to allocate capital between savers and borrowers. The rise of capitalism in Western Europe and other parts of the world was accompanied by the development and evolution of banks and financial institutions as well as financial markets like the bond and stock markets to efficiently allocate capital between 'savers' or 'investors', i.e. those who have capital to 'borrowers' or 'entrepreneurs', i.e. those who need capital.

Traces of banking activity can be found in ancient times but after the fall of Rome and the rise of Christianity, the charging of interest (usury) was seen as immoral and banking was gradually abandoned in Western Europe. Around the 12th and 13th century, a growing volume of international trade in a number of agricultural commodities and manufactured goods stimulated the reemergence of banking in Western Europe. The word '**bank**' is derived from the Italian word *banci*, from the moneychangers or foreign exchange dealers in Florence during this period who conducted their business seated at benches (or *banci*) behind tables in a street. They came to be known as the *bankers* (*banchieri*). The most famous and powerful bank during the 14th and 15th century was the Medici Bank which had branches all over Italy and was bigger and more diversified than any other financial institution. A notable contribution of the Medici to the field of accounting was an improvement of the general ledger system for tracking debits and credits.

The Italian Banking system became the model for other Northern European nations including the Dutch, English and the Swedes. Over a period of time the various usury laws were scrapped and a wide variety of banks proliferated in Europe.

One of the major advances in the field of banking occurred in London with the creation of the Bank of England in 1694 which became a precursor for other central banks around the world. Among the powers that central banks were gradually granted was the monopoly right to issue bank notes, setting of monetary policy including the official interest rates and to act as lender of last resort in a financial crisis. (The editor of *The Economist*, Walter Bagehot, in the 1870s, reformulated the proper role of a central bank as a lender of last resort, to lend freely, albeit at a penalty rate, to combat a liquidity crisis)

Along with the development of banking, another major contribution of the Italian City states in the 14th and 15th century was the development of the bond market.

This was followed by the third major development in field of finance – the formation of the joint stock company in the early 1600s. Most famous among the earliest stock corporations were the English and Dutch East India Company. In the four hundred years since shares have been bought and sold, there have been a succession of financial bubbles and crisis. The most notable stock market bubbles during the 18th century were:

- i) The South Sea Bubble in England
- ii) The Mississippi Bubble and the chaotic economic collapse of France

These and other financial bubbles and crises around that period have been chronicled by Charles Mackay in a book called 'Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds'.

The Evolution of Banking in the United States: From 1776 to the Great Depression

The evolution of banking in the US was quite different to the one in Western Europe. Legislators in the US were wary of financiers and this twice led to the failure of formation of a central bank (the first and second banks of the United States). Throughout the 19th century, large number of national and state chartered banks were established which had the power to issue their own currency.

But these under capitalized banks were a recipe for financial instability and panics were a regular feature of American economic life in the last quarter of the 19th and early 20th century. The Great Panic of 1907 finally led to the setup of a commission to investigate the crisis and propose future solutions and renewed demands for banking and currency reform. Amongst the proposed solutions was the setting up of the Federal Reserve System, the US Central Banking System, in 1913.

After the end of WWI in 1918, the “Roaring 1920s” finally ended with the bursting of the Stock market bubble – the Great Crash of 1929. The following decade in the 1930s, '**The Great Depression**' saw the largest and more severe economic downturn worldwide in the 20th century. The Pecora Investigation conducted in 1932 to investigate the causes of the Crash of 1929 uncovered a wide range of dubious business practices and conflicts of interest within the financial system. The hearings galvanized public support for the passage of several banking and securities laws like:

- 1) The Banking Act (Glass Steagall Act) of 1933 which separated commercial and investment banks and established the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) for insuring bank deposits. The FDIC model was later adopted by many countries to avoid bank runs in future financial crises.
- 2) The Securities Act of 1933 for regulating securities markets and for investor protection.
- 3) The Securities and Exchange Act of 1934 which created the Securities and Exchange Commission (SEC) for enforcing the federal securities laws and regulating the securities industry and the nation's securities exchanges.

Post WWII to the 2000s

The first couple of decades after WWII were characterized by a rapid growth in the economies of US, Western Europe and Japan. This post WWII global expansion was underpinned by the **Bretton Woods system** of rules for commercial and financial relations among the world's major industrial countries. The Bretton Woods agreement provided for a system of fixed exchange rates and

established the International Monetary Fund (IMF) and World Bank to stabilize international exchange rates and facilitate development in developing countries. In the early 1970s, President Nixon took the dollar off the gold standard (the **Nixon Shock**) and eventually the Bretton Woods system collapsed and the fixed rate peg for the major currencies was dropped. After a period of relative economic stability of almost 3 decades since the end of WWII, the First Oil Crisis of 1973 and stock market crash of 1973-74 ushered in the first economic downturn since the Great Depression.

In the 1980s, the collapse of the real estate boom fueled by the deregulated savings and loans industry led to the failure of almost 800 savings and loan banks. The ultimate cost of the S&L crisis was estimated to be almost 160 billion dollars and at that time it was the biggest real estate bust ever in the US.

In 1997-98, the Asian Financial Crisis severely impacted the economies of Thailand, Indonesia, Malaysia, Korea and most of the other countries in South East Asia.

1950s to 2000s - Japanese Economic Miracle to Financial Crisis

From the 1950s to the 1980s, Japan experienced a record period of rapid economic growth which has been called the Japanese Economic Miracle. During the later part of the 1980s, speculative activity drove up the prices of stocks and real estate in Japan. The Nikkei 225 Stock Index rose to an all time high of around 39,000 in Dec 1989. Real estate prices also skyrocketed and at one time the land around the Imperial Palace in Tokyo was estimated to be worth more than the land of California. But beginning in 1990, the bubble eventually burst and the stock market began a downward spiral. The following decade in the 1990s and early 2000s, the Japanese economy faced a period of stagnant growth and this period is often known as Japan's 'Lost Decade'. Over this period the Nikkei stock Index fell from a high of around 39,000 to a low in the 7000 range. And commercial real estate

prices fell as much as 87% over this period. It is estimated that the cumulative capital losses on shares and land since 1990 reached \$15 trillion or about 3 times Japan's GDP.

Global Financial Crisis – The Great Recession?

Since its onset towards the end of 2007, the current economic recession has lasted for almost 18 months making it the longest and steepest global recession since WWII. But in most major economies including the US, the sense of freefall in the economy seems to be over and the economies seem to be on the brink of recovery in the second half of 2009.

If we have averted the financial meltdown that seemed imminent during Sep 2008, it can be attributed in no small measure to lessons learnt from the Great Depression and other financial crises like the ones faced by Japan. Once they realized the magnitude of the crisis, Central Bankers and Finance Ministers implemented a series of extraordinary policy measures based on their understanding of these past crises. Though the risks of another leg down in the economy (a double dip recession) remain, the fears that we were headed for 'Great Depression II' seem to have abated. Instead, the current financial crisis has been dubbed by some as the '**Great Recession**'.

Financial Regulation and Reform – 2009 and Beyond~

While the world seems wiser when it comes to post-crisis management, it has often fallen short when it comes to preventing a crisis. As we have seen, financial crises have continued to recur

“Take away the punch bowl just as the party gets going. Lean against the winds of deflation or inflation, whichever way they are blowing”

frequently throughout financial history - asset bubbles like stock and real estate bubbles are all too common. With increasing globalization of finance in the latter part of the 20th century, the more recent

crises have been larger and global in scale. After every major financial crisis, there have always been broad attempts by politicians and lawmakers to devise new rules and regulations to prevent another similar crisis. The laws and regulations passed after the Great Depression are widely credited with creating a more stable financial system from the 1940s to 1970s. The leading central banker of that period, William McChesney Martin, Chairman of US Federal Reserve from 1951 to 1970, supported monitoring and pricking asset bubbles before they could be damaging to the whole system. The job of the central bank, he said, is to **“take away the punch bowl just as the party gets going”**. “Our purpose”, as William McChesney Martin put it, “is to **lean against the winds** of deflation or inflation, whichever way they are blowing”.

However from the 1980s onwards, rapid financial innovation, financial globalization and deregulation have exposed gaps in the existing regulatory system which has been attributed as one of the causes for the global financial crisis. So this time too, sweeping financial reform proposals have been put forward by the US, UK and EU officials to update and modernize our current regulatory structure to prevent future crisis. These efforts are being co-ordinated globally through the G-20 Forum. The reforms cover a broad gamut

of areas that have been put forward as causes for the current crisis – including securitization, financial derivatives, rating agencies, misaligned compensation incentives, excessive debt, leverage and so on. Since a lot of these issues seem complex and confusing, this debate on how to reform and build a new architecture for the financial system is being carried out with the broader public aloof and mostly disengaged with the details. The nuances and details of financial reform is no longer the lead story on TV and is off the front pages of the newspapers.

As the leaders of the G20 nations prepare to meet for the Pittsburgh Summit in late Sep 2009, with the financial markets slowly healing, the imperative and urgency for revamping financial rules seems to be diminishing. Given the recurring nature of financial crises throughout history, some people also view with skepticism any attempts by lawmakers to come up with solutions which would prevent another financial crisis from ever happening again. However, the outcome of this G20 summit and subsequent proposals that emerge later this year must be watched with interest. Throughout history, most major laws to change the financial system always arose from the cauldron of a crisis. This time too proposals may emerge that could contribute in putting together a more robust global financial system that is less prone to crisis. ☺

Is There A Coming Transformation?

This brief article has been written with the intention of provoking discussions that challenge the status quo. Clearly, doing more of the same thing could be a recipe for disaster.

Udita Ghosh & Viswa Ghosh

[Key words:
reciprocity, speculation,
entrepreneurship,
fictitious commodity,
“double movement”]

The “market” today is at the core of human life in most parts of the world. In the 21st century much of human activity is driven by the mechanisms of a market invisible to the eye, which manages to harness the powers of human self-interest to sustain itself. But after several cycles of economic expansions and recessions, we are still grappling with the fluctuations of this system.

The *laissez faire* philosophy (literal meaning is ‘to let be’, and in the context of markets it implies free or self-regulated markets) suggests that government has no place in the market other than allowing it to function freely, and any interference is foolish, that the market should be independent and all-powerful. The market, it is said, has “an invisible hand” which rights the wrongs. Of course, we conveniently forget that there is also the ‘invisible foot’ that does much harm!

Unfortunately, in our modern *Market civilization* (aka, *laissez faire* economy) ups and downs do not remain confined to the financial markets – they adversely impact the substantive economy, which means peoples’ livelihoods, healthcare and homesteads are adversely impacted. Statistics released by the *Bureau of Labor Statistics* (U.S.) shows unemployment rate to have reached 9.5% in June 2009, with the state of Michigan registering the highest rate (15.2%). The market may correct itself in due time, but what of the lives of people affected by the precipitate falls?

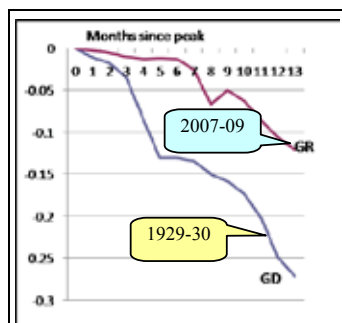


Chart-1

(Ref: Paul Krugman in New York Times, March 20, 2009)

On this count, note that a life once destroyed is NOT reversible. The so-called reversibility principle does not function effortlessly or smoothly – most lives remain devastated for ever! The laissez faire-ists (like Professor Milton Friedman) conveniently ignore this.

The chart (Chart-1) displayed above reveals the comparative declines in industrial production from their previous peaks in 1929-30 and 2007-09 respectively. The peak in the left corner, representing high industrial production in a time of prosperity, is followed by falling production rates, finally leading to stages of very low industrial production in a time of economic decline. In October 2007, the Dow, which is an index measuring the ups and downs of stock prices in the U.S., peaked at 14,164.53. As of writing, this index crashed to a low of about 8,200 in May 2009. The decline during the current recession clearly matches that of the decline during the Great Depression of 1929-30.

These are two of the most severe downturns that our market society has experienced so far in less than 100 years, the first of which brought the Nazis (in Germany) and the Fascists (in Italy, Spain and Vichy France) to power with terrible consequences for the entire world, not to forget the Holocaust.

When we see and experience these social devastations, a question that springs to mind is:

Why are our market systems susceptible to these boom (UP) and bust (DOWN) speculative cycles?

Stone tools dating back to 50,000 to 100,000 B.C., produced in Eurasia have been found in the Soan Valley (present day Pakistan). In more recent times, the Old Testament, the Book of Ezekiel, lists trade in wooden planks from Semir; cedar from Lebanon; oars made of oak from Bashan; ivory laid pine decks (for ships) from Cyprus; silver, tin and lead from Tarshish; embroidered linen from Egypt; wheat, olives, early figs, honey, oil and balm from Juda and the land of Israel; white wool and wine from Uzal, etc.

Substantive Markets

Markets have existed since the early days of human civilization. Archeological records show that human populations have traded and bartered since prehistoric times both within as well as across food sharing units. These early trade and barter relationships did not lead to price-making markets. Nor was the goal merely profiteering. This was *Oikonomika*, (traditional term: *oconomica*) a Greek word used by the great philosopher, Aristotle (384-322 B.C.), to characterize the social organization that was focused on ‘household management’. Privileged to observe an increase in the price-making markets in his lifetime, Aristotle characterized these latter by the Greek term *Chrematistica* (signifying intent on ‘gain’).

Interestingly, the Greeks (perhaps, quite fittingly) had the sense to segregate the *Chrematistica* (gain-orientation) from *Oikonomika* (household provisioning) to protect human livelihoods. Contrarily our *market civilization* forces human provisioning to take place in obedience to human-made laws instead of the biophysical laws of the natural world.

Thus, two major features of these early markets stand out in stark contrast to our present-day *Market civilization*:

1. One, the gain-oriented *chrematistica* was restricted to agoras outside the city walls to prevent it from sullyng the provisioning mechanism within the Greek cities; and
2. Two, food items (considered as the most life-preserving of substances) were generally barred from being part of the gain-oriented *chrematistica*.

Reciprocal Relations in the Ancient World

Scholars have identified these early trade and barter relationships as Reciprocal relations. One of the scholars, Karl Polanyi (1886-1964), characterized such reciprocity as a relation that “demands adequacy, not mathematical equality.” Supplying for substantive human needs was the fundamental goal of these reciprocal relations; provisioning with an eye to maintaining and preserving human lives.

Karl Polanyi, *The Great Transformation*, Boston: Beacon Press, 1957, p. 73.

Aristotle’s Greece protected the life-preserving *oikonomia* against the ravages of a gain-oriented *chrematistica*. Contrastingly, in our 21st century *market civilization* ‘speculation’ is almost worshipped as a god and any criticism of speculation or of speculative bubbles meets with unfavorable retorts.¹

How did this major transformation come about, from a world that looked down upon gain and speculation to ours that reveres both?

“Markets are Totem in our modern culture,”

the famous economist, ex-ambassador to India and Padma Vibhushan (awarded in 2001), Professor John Kenneth Galbraith (1908-2006) had once exclaimed.

(John K. Galbraith, *A Short History of Financial Euphoria*, New York: Penguin Books, 1994, p. 24.)

“The Great Transformation”

The transformation from markets that were focused on provisioning to markets that are focused on greed (also read, speculation and gain) is one of the major social revolutions in human history. In a matter of less than a millennium markets that were once deeply embedded in social values and cultures (primarily concerned with supplying for households) gave way to markets that are removed from the goals of provisioning.

While we unquestioningly accept the “truck and barter” of elements of the production process (land, labor and capital)

deeper investigation reveals that these are “fictitious commodities” because essentially they are not produced for sale. In fact, they are strictly non-produced.

Proponents of our modern economic system have argued that the market system reflects our ‘natural state’. This claim to a natural propensity was first made by Adam Smith (1723-90) in his famous *Wealth of Nations*.² In his perspective, nations were singular entities that must specialize in the production of a good which they can each produce most efficiently and then exchange, buy and sell products with other nations based on the ability of each. This was further developed by David Ricardo (1772-1823) as a theory of “comparative advantage.”

Commodification of land started with the “Enclosures” process – that of converting common land available for cultivation into sheep rearing pastures – as early as the 1300s in England and ended as late as the 1800s in both England and in continental Europe. Land prior to this process was considered to be owned by all, used by any and all farmers.

The “**Enclosures**” process was paralleled by farmers’ revolts in both England and Wales. Given the level of devastation, even the ruling Tudors were forced to intervene by passing anti-enclosure legislation to stop villagers from being pauperized and from being converted into vagrants and criminals.

With the commodification of land proceeded the simultaneous commodification of labor. Rural impoverishment forced labor into ghetto-like living conditions for industrial labor in towns and cities.

“Double Movement”

Every time human livelihood is threatened society has responded to protect lives against the socially engineered laws of supply & demand. As one set of social forces moved to create self-regulated, price-forming markets opposing social forces organized labor to preserve livelihood.

Karl Polanyi, *The Great Transformation*, Boston: Beacon Press, 1957.

Now, let us turn to the more controversial and yet another “fictitious commodity” that of money. In finance, this is called capital. United Kingdom was the first to adopt the gold standard in 1717. Capital, being pegged to the gold standard, was thus restricted in its creation because the amount of gold available limited the amount of money or capital that could be printed to represent it.

By linking money directly to something produced and sold like gold, it was possible to treat capital also like a commodity. Again, like land and labor, capital too is not produced and, hence, is a “fictitious commodity.”

Robert Owen (1771-1858) was the first to forcefully argue against the metallic standard and had instead proposed “free issue (of capital) concomitant with the production of goods.³ More than a century later, during the

Great Depression of 1930s, John Maynard Keynes (1883-1946) was to again argue equally forcefully against linking the value of money to an artificial gold standard. Finally, human society was to eliminate the fatally flawed (and repeated) attempts at establishing *money* (or capital) as the third fictitious commodity. It goes to President Nixon's credit that he led U.S. off the gold standard in 1971, thus finally eliminating the commodity fiction of money or capital.⁴

The markets that we are familiar with today grew out of the transformation of land, labor and capital into commodities; something that can be bought and sold in the marketplace. Over many centuries these three were gradually transformed into saleable goods. This change was not a physical change of the actual goods; it was rather a change in attitude to these and our evaluation of them. There was nothing "natural" about these social changes.

"...subjecting land, labor and capital to the so-called self-regulatory market forces have proved to be problematic." - Karl Polanyi

They were *violent* in all senses of the word!

From the brief discussion above it becomes fairly clear that subjecting land, labor and capital to the so-called self-regulatory market forces have proved to be problematic. In his seminal work, *The Great Transformation*, Karl Polanyi showed the deceptive nature of these momentous social transformations toward *market civilization*. Our move toward *market civilization*, and towards the subjugation of nearly all of society to self-regulating market forces and to the so-called laws of supply & demand, have been paralleled by violence and social misery. In moving towards *market civilization* we have managed to hide the original purpose of the market under abundant layers of profiteering and speculation. But we cannot protect ourselves when human greed, channeled by the market system, oversteps itself and disrupts the other functions of life and society. And this is because we have pegged all that is important in our lives to a fickle and amoral system. *Society*, in turn, has been forced to react in various ways to protect itself from being devastated, as it is attempting to do so once again presently.

Thus, two major social transformations have brought human civilization to its current state of affairs. To recap, these two transformations were:

1. ONE, veneration of greed (as opposed to the primacy of 'protection of livelihood' over gain and speculation).⁵
2. TWO, creation of "fictitious commodities" out of land, labor and capital, which are originally non-produced and also originally not meant for "truck and barter."

Do we see any silver lining on the horizon that points toward an end to speculation in order to strengthen markets and the entrepreneurial spirit?

Coming Transformation?

To be sure, rolling back the two transformations described above will not be easy. For hundreds of years we have bent the rod in one way. To straighten it the rod now needs to be bent as much in the other direction.⁶ With so much of history now known to us, with so much more awareness and with so much at stake (including global warming and population explosion), can we hope to bend the rod the other way easily?

As the world continues to reel simultaneously under *four* major crises – speculation in energy prices,⁷ rise in food prices, acceleration of global warming and the current financial crises – surely, one hopes that more comprehensive measures will be initiated to end speculation once and for all. Ending speculation is an *apriori* condition to strengthening *markets* and the entrepreneurial spirit. Even if they are not ended completely, one hopes that their impacts on the substantive economy will be eliminated.

Entrepreneurship vs. Speculation

Very perceptively Keynes had pointed out, “Speculators may do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise. But the position is serious when enterprise becomes the bubble on a whirlpool of speculation.” He further went on to say, “When the capital development of a country becomes a by-product of the activities of a casino, the job is likely to be ill-done.”

John M. Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, London: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1953, p. 159.

Galbraith referred to such cyclical euphoric and speculative episodes as “mass escape from reality.”

John K. Galbraith, *A Short History of Financial Euphoria*, New York: Penguin Books, 1994, p. 12.

A number of proposals are on the anvil with the G8 and the G20 group of nations. Yet, despite the well-meaning statements on “commitment to standards of propriety, integrity and transparency” one notes that none address the fundamental problem of speculation and greed. Unfortunately, for some deep pathological reasons genuine enterprise is equated with speculation. Very little effort is made to distinguish between the two. Where enterprise requires long-term vision, foresight and hard work, speculation is quite the contrary on all counts.

there will be losers. The good thing though is that the losers in this case (if and when it comes about) will be mainly the fraudsters. History of speculative booms reveal very interestingly that all of them have been based either on financial frauds (Charles Ponzi and Bernard Madoff being some of the recent infamous ones) or on so-called financial innovations that have tried to pass off debts secured either inadequately by real or by false assets.⁸

While President Obama’s election brought with it much hopes of a different world order, unfortunately the necessary political and intellectual capital required to support him remains conspicuously absent. The horrific thought that often comes to mind is: Are we waiting for another Hitler and another holocaust before we decide to mend our ways? Wonder where is humanity headed. *Quo vadis?* 🌀

¹ For criticizing the speculative bubble of late 1980s Galbraith was faced with the “corroding observation”: “Galbraith doesn’t like to see people making money...” John K. Galbraith, *A Short History of Financial Euphoria*, New York: Penguin Books, 1994, p. 10.

² As a ‘moral philosopher’ Adam Smith was an epitome of contradictions. On the one hand, he believed that human being’s altruistic nature would lead them to take the right action in the interest of society. On the other, he also presumed that human being’s selfish nature (and private interests) would lead towards the “general good” of society. “What sympathy accomplishes in the moral world, self-interest does in the economic one.” Henry William Spiegel, *The Growth of Economic Thought* (3rd edition), London: Duke University Press, 1991, pp. 226 & 229.

³ Ibid. Henry W. Spiegel, p. 441.

⁴ It is interesting to note that certain social forces are now re-attempting to take society back to a “gold standard” and simultaneously eliminating the role of a monetary authority like the Federal Reserve. Prominent amongst these retrograde social forces is one Ron Paul, U.S. House of Representatives from Texas and also one of the Republican presidential candidates in 2008.

⁵ In *Merchant of Venice*, written in 1598, Shakespeare portrayed an European civilization that had not yet handed over reign to greed. In the play, Antonio is protected by the Duke of Venice from giving his “pound of flesh” to Shylock.

⁶ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Vols. I & II, Edited by R.H. Campbell and A.S. Skinner, Oxford: Clarendon Press, p. 664. This metaphor was used by Adam Smith in the context of social transformations.

⁷ The global energy markets reveal very interesting speculative thrusts that completely negate the role of supply-demand to self-regulate markets. Even analysts have been forced to remark that “Crude oil prices appear to have been divorced from the underlying fundamentals of weak demand, ample supply and high inventories.” Jad Mouawad, “Swings in Price of Oil Hobble Forecasting,” *New York Times*, July 5, 2009.

⁸ The Reserve Bank of India (RBI) initiated strict measures to avoid feeding the recent speculative bubble. One, as land prices sky-rocketed Dr. Reddy (the then Governor of RBI) banned the use of bank loans for buying land but allowed them for construction purposes only. Two, RBI banned the use of securitization of loans, thus, forcing banks in India to hold on to the loans in their balance sheets. Three, seeing the real estate bubble emerging RBI pushed interest rates beyond 20% to “dampen the housing frenzy.” Joe Nocera, “How India Avoided a Crisis,” *New York Times*, December 19, 2008.

Life Style Change *Plus* towards Sustainable Society

Anindya Bhattacharya

“Change” itself is an indication of life. Since the beginning of the life, millions of years back on this earth, changes are happening in every second through various means and mechanisms through evolution or through morphological development at physical, chemical or biological level. It is obvious on this living earth that change is bound to happen for a lively society. But the problem is, over interference of human being in the natural process of change and development in the recent days. By the strength of intelligence and power of understanding the physical phenomenon, human beings are gradually getting over the natural process of development and sustenance of the nature. Initially, those anthropogenic influences were for its survival against natural odds but gradually it became interference for sustained and peaceful survival and finally it became interference for concurring the nature and its system for selfish and lavish living. During the whole process of development, change is occurring as an observable phenomenon but the impacts of such changes are getting transformed from time to time from social benefits to social costs.

Dichotomous development

Nobel laureate economist Simon Kuznets, developed the theory of economic growth linked to the surrounding physical environment of the beneficiaries of the economic development in such a fashion which predicts that during the initial stages of development, perturbation in the surrounding environment is more compared to the later stage of development. In a simplified manner during the early stages of development environmental degradation were more but it would decrease while the mankind would further develop in future. In principle the Kuznets theorem indicates the natural healing of the environmental degradation by the virtue of the economic wealth. Nevertheless, the problem remains on this earth. Even though the global wealth is increasing but the global environmental quality is decreasing. Kuznets theorem here fails apparently to explain such phenomenon in the scope of its broad generalization. However, country specific scenarios are remarkably different.

Developed and richer countries are enjoying better environmental and natural system quality while the developing and poorer countries are plunging into the natural distresses at a faster pace. While economists are criticizing this dichotomy of the Kuznets Curve theory based on its lack of wide scale applicability, a new linking mechanism has been proposed between the ‘have’ and ‘have-nots’ on this world to unify the fate of the man kind on a same cord and bring the KC principle widely applicable. It appears that there are two different worlds and two different systems working on a single earth-system framework while physically, chemically and biologically they are inseparable. This apparent separation (based on economic prosperity and geographic location) with inherent linkage is perhaps the basic problem of this world to combat the environmental degradation and its related social costs. While Dr. Kuznets proposed his theory, he perhaps assumed that mankind is inseparable and follows the same principle of development and its perturbation on the surrounding environment and he perhaps never thought that the future development on this earth will be governed by the rule of differentiated bargaining power of resource extraction and its utilization for economic growth from the global pool of natural resource endowment. This is perhaps caused the failure of his theory at a global scale. Mankind is experiencing the changes in all aspect of its life but the impacts of changes are differentiated by the human manipulation of the system based on economic wellbeing.

Global public bad: A tool to change the global environment

While we were talking about linking the two virtual worlds divided on the basis of material affluence and differentiated bargaining capacity in the global natural resource endowment market, “global warming and climate change” is playing an important role to bring them together and tie them up in a same cord. This characteristically “public bad” (without ownership of the polluter and impacting irrespective of the geographical location) phenomenon has

awakened the richer nations from their prolonged ignorance towards the global development scenario. Undisturbed enjoyment of the economic benefits and better environmental systems are now threatened due to increasing environmental degradation and its subsequent effect on climate change. Irrespective of its sources of creation, it is adversely affecting the whole world including the richer countries and thus it is the linkage between the have and have-nots on this world to work jointly for a global betterment.

Taking the advantages of differentiated marginal cost and benefits of using a developing country platform for production and thereafter consumption in the costlier developed countries became the key principle for economic prosperity for the most of the industrialized countries in the world during the twentieth century. Post World War II regime was primarily focused on such decentralization of the dirtier production from the so called developed countries to the developing countries under the different headings of post war economic assistance to the war ravaged countries across the world. It undoubtedly helped the world on one hand to combat the deep economic crisis and to break the inertia of investment for economic growth but on the other hand created thousands of “pollution heavens” at the cost of poor peoples’ health, wealth and natural endowment in several developing poorer nations. Such economic colonization and so called development federalism under the auspices of hundreds of international trade treaties, agreements and conventions perhaps engendered the creation of a new world of have-nots very unknowingly. The myth of natural resource endowment curse i.e. where people are poorer, natural resources are more, became reality in the world. Due to prolonged dependence on the foreign aid and assistance for survival and due to continuous extraction of resources for export oriented production, developing countries are gradually getting crippled even to stand on their own and fight against poverty. Fortunately, Asian developing countries along with some Latin American countries came out from this systematic crippling mechanism during the early nineties by the grace of the global movement of human development and fiscal federalism. Thanks to Rio Earth Summit in 1992, that further exposed to the whole world the fragile condition of the global natural system engendered due to reckless exploitation by the whole mankind. World realized that the global change actually turned the development wheel backward without anyone’s notice and are pulling down the whole biosphere towards

the point of extinction. Kuznets theorem fails again in this context where the developed countries are also facing the problem of global pollution irrespective of their economic prosperity. In this context, perhaps a little modification is needed for the theorem in the context of its specificity on the nature of the pollution as an environmental bad linked to the change of economic standard and wealth. Over the last fifty years of development the world faced the most rapid degradation of its environment characteristically as global bad in all sphere of the environment and the natural system. But it is the most prominent factor which brought the two worlds on a same platform for the hope of survival.

Who is responsible?

Who is responsible for the degradation of the earth environmental system is a real challenging question in front of the world. Debate is on since last couple of decades to identify a sharing mechanism of this responsibility and to act on it accordingly. The most accepted principle of differentiated but common responsibility of cleaning up the world is still having plenty of drawbacks especially in the process of quantifying the burden for the developed countries that have been polluting this earth since decades. The ethical principle of fairness to share the responsibility is still debated based on the two most contemporary theories of consequentialism and non-consequentialism where the issues of morally right act and the act based on its impact (right or wrong) are the two most contentious oppositions. The mechanism further gets complicated due to non availability of the globally acceptable historical data on emissions for each country which would be the basis of such sharing mechanism. Amidst this volatility and complexity of this situation, the only global convention on climate change (UNFCCC) with its widely discussed Kyoto Protocol is plunging in the uncertainty of its future shape and mechanism. As per the Protocol, 2009 is the year when the world has to decide whether and how to take this climate change negotiation beyond its first commitment period of 2012. Historically, the current developed countries happened to change their life style towards more sophistication and luxury at the cost of the natural degradation for decades and now the so called transitional economies like China, India and Brazil are catching up with them in terms of total national emissions(not at per capita level). Only United States alone is responsible for more than 23% of the

total global green house gas emissions (the so called indication of global warming) while India is only for 3%. The international debate is on this whether India and US should be treated as equal in the context of emissions reduction and cleaning up activities or not. Though this is beyond the scope of this discussion but one thing is very evident that unless there is a clear linkage (quantifiable and verifiable) established between the developed and developing countries to combat the global bad phenomenon of climate change it is impossible for any sovereign developing country to justify any mitigating measures which is in other way an additional economic burden on the economy. In the classical game theoretic view the negotiation will be stuck at the developing country bottle neck where the countries will vouch for no action to avoid any financial loss due to mitigating measures. Developed countries have set the lifestyle standard at a very high level which is in a physical term can be called as high gradient and therefore attracting all other less developed countries towards that by the natural law of equilibrium. World has seen the height of the luxury at the Beverly Hill in the contrast of the Ethiopian human refugee camps in Africa and set the ball rolling towards betterment from extreme distress. There is perhaps no physical explanation and logic to convince the developing world to stop consuming and act prudent to combat the climate change and stop near future annihilation.

Life style change: Setting the example and linking the world

Once the great Indian poet and Nobel laureate Rabindra Nath Tagore mentioned that the best way to teach other about behavior is to behave properly by yourself. This is nothing but an axiom of social restructuring in a simplistic form. As per the scientific evidences and numerical projections about the fate of this earth in the context of increasing pollution and global warming, time is very limited for us before we reach the point of no return. To avoid such catastrophic disaster it is prudent to act immediately with whatever tool we have right now. International negotiation on responsibility burden sharing based on fairness and equity is a fairly complex mechanism and greatly time consuming. In fact there is no such time line when such agreement can be reached. But we all are overlooking a simple mechanism to combat such global problem which is to start working at home and within our respective country. Based on the standard

practice of using less resources for development and different path of economic prosperity which are available through various channels of scientific researches the efforts can be made to restrain the emissions. This is especially true for the developed countries to think internally to change their luxurious lifestyle to a moderate one in a gradual process. It is very important for them to continuously show case such life style changes to the developing world through media, internet and even through movies. Demonstrated evidences of such activities can set a new target for the developing countries like the same way it crated for the luxurious life style. This is purely a bargaining compromise of the sharing of the global resource endowment between the developed and the developing countries when no agreement can be a fatal decision for both. It is important to reach an equilibrium point of resource utilization where both the two worlds can attain their respective happiness and desired prosperity. In a mathematical way it is feasible by continuously narrowing down the difference between the threat point outcome (here the no agreement point) and the so called suboptimal intermediate equilibrium (the famous John Nash equilibrium of a non-cooperative game) to elevate the equilibrium benefits for both the parties in the negotiation. Irrespective of its mathematical complexity, the actual reality of doing so is rather simple and easily implementable. By the virtue of the economic power, if the developed countries take the lead to first set a new life style target and then link them to the rest of the world through active hand-holding mechanism the problem can be solved with a definite timeframe. Developing country people want assistance in true sense and not as so called ODA or Adaptation Fund and perhaps rather as a fellow human being facing the same trouble on this earth. Hand holding doesn't mean creating the complexity of superiority upon subordinate but it means guiding the friends to walk on a difficult terrain. Economic assistance could be a part of the hand holding activities but it should mean more than actual money transfer which will make the difference in reality. I propose this as "Lifestyle Change Plus" concept which not only fulfills the physical need of the developing countries to come up to level of new social equilibrium but also bridges the mental gap between the two worlds prevailing due to the current economic disparities among them. It is expected that this LCP can act as a necessary condition for Kuznets Theorem to work globally.

পরিবর্তন - কয়েক টকরো স্মৃতি , কিছু উপলব্ধি

কল্যাণ দাশগুপ্ত

প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ওপার থেকে এবার আদেশ , ২০০৯-এ ‘অঞ্জলি’র জন্য প্রবন্ধ চাই, বিষয় - ‘পরিবর্তন’। ব্যাপারটা দুঃসাধ্য বলে মনে হয় নি প্রথমটা , কিন্তু লিখতে বসে আক্কেল হল , পরিবর্তনের ধাক্কা সয়ে এদিন টিকে থাকার একটি দুর্ভোগ , বহু স্মৃতির পানাপুকুর ঘেঁটে পাঠক-পাঠিকদের কাছে পরিবেশনযোগ্য বিশেষ কোনও একটি স্মৃতিকে ছেঁকে তুলতে গিয়ে জন্ম হওয়া। তবু কেন জানিনা , শেষ পর্যন্ত দেখছি লিখতে বসে গিয়েছি।

১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে আমাদের দেশে একাধিক জাপানি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ছিল কলকাতা শহরে। এদের একটিতে আমার সুযোগ হয়েছিল বছর খানেক কাজ করার। সুযোগই , অর্থাৎ সু-যোগই বলব , কেননা জাপানি অফিসের তৎকালীন কার্যনির্বাহ পদ্ধতি যা দেখেছি , এ-নইলে তা সম্ভব হত না। একটি উদাহরণ দেই।

জাপানি প্রতিষ্ঠানের বহির্জাপান -শাখাগুলির সামনে সে-যুগে আকস্মিক প্রয়োজনে স্বদেশে অবস্থিত কেন্দ্রীয় দপ্তরের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগের পথ মাত্র দুটিই খোলা ছিল। প্রথমত টেলিফোন , যার ব্যবহার খুব একটা চোখে পড়ে নি। হয়তো গুরুতর বিষয়ে টেলিফোনে সব কথা গুছিয়ে বলা যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় ছিল। তার থেকে অনেক সহজ ছিল বক্তব্য বিষয় টেলিপ্রিন্টার যন্ত্রে টাইপ করে তাকে অবিলম্বে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির টেবিলে পৌঁছে দেওয়া। এতে অবশ্য একটা মস্ত বড় অসুবিধাও ছিল। কানা-কানজিতে লেখা চিঠি টেলিপ্রিন্টারে পাঠানো তখন সম্ভব ছিল না। কাজেই তেমন চিঠি তখন বিদ্যুৎ -বাহিত হত রোমক হরফে। বহু সময়ে টেলিগ্রাম করতে হত , তা-ও ঐ a-b-c-d তে লেখা জাপানিতে। একবার মনে আছে এরকমই এক টেলিগ্রাম অথবা টেলিপ্রিন্টারের (মনে নেই কোনটি) ঘাড়ে চেপে পৌঁছানো চিঠিতে কলকাতার বড় সাহেবরা কাবু হলেন শব্দ বিশেষের ধাক্কা। শব্দটি ‘কানেৎসু’। জাপানি বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এটি ‘তাপিত করা’-ও (অর্থাৎ গরম করা) হতে পারে , আবার ‘অতিতাপিত করা’ বা superheat-ও হতে পারে। জাপানি লিখন পদ্ধতি হলে ‘কানেৎসু’-র ‘কা’ লিখতে ‘তাপিত করা’-র ক্ষেত্রে যে চিনা অক্ষরটি ব্যবহার করা হয় , ‘অতিতাপিত করা’ লিখতে তার থেকে ভিন্ন অন্য একটি চিনা লিপির প্রয়োগ বিধেয়। কিন্তু রোমক হরফে তো এক kaই সম্ভব। মনে আছে সমস্যার সমাধান করতে সঙ্গে সঙ্গে জাপানে ফিরতি টেলিগ্রাম (অথবা টেলিপ্রিন্টার-- চিঠি) পাঠাতে হয়েছিল সেবার।

সাধারণ চিঠি আদানপ্রদানে অবশ্য ডাকবিভাগেরই শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। বিদ্যুৎচালিত নয় , এমন ইংরিজি (অথবা বাংলা) টাইপযন্ত্রের সঙ্গে পাঠক-পাঠিকদের কারও কারও হয়তো চাক্ষুষ পরিচয় আছে , বস্তুটি ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা

থাক বা না থাক। এর একটি জাপানি সংস্করণও ছিল , তার গল্পে পরে আসছি। কলকাতায় জাপানি সংস্করণটি যতদূর শুনেছি একমাত্র কনসুলেট অফিসেই বিরাজ করত। আমি কোনও জাপানি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ যন্ত্রটিকে দেখি নি। জাপানি ভাষায় যেসব চিঠি যেত আসত , তা সবই লেখা হত হাতে। সাহেবদের স্ব-স্ব টেবিলে বসে এমন চিঠি লিখতে আমি বহুবার দেখেছি। যেমন দেখেছি জাপানের বড়কর্তাদের কাছ থেকে আসা জাপানি অক্ষরে চিঠি। এই দ্বিতীয়টির সঙ্গে প্রথমটির , অর্থাৎ কলকাতা থেকে যেসব চিঠি যেত তাদের , একটা লক্ষণীয় তফাৎ ছিল। জাপান থেকে আসত যেসব চিঠি , তার হস্তাক্ষর ছিল মুগ্ধ করার মতো। শুনেছি এসব চিঠি লিখত লিপিশিল্পে (calligraphy) তালিম নেওয়া অফিস-বালারা , জাপানে এখন যাঁরা OL অভিধায় পরিচিত। কলকাতায় সাহেবদের মধ্যেও লিপিদক্ষ ব্যক্তি নিশ্চয়ই থেকে থাকবেন , আমার দুর্ভাগ্য তাদের দেখা পাই নি।

আমি কলকাতায় থাকতে Fax-যন্ত্র কখনও ব্যবহার করিনি , চোখে দেখেছি বলেও মনে পড়েনা। নাম শুনেছিলাম কী ? কিন্তু জাপানে পৌঁছে তার সঙ্গে পরিচয় হল। কখন হল মনে নেই , তবে হতে না হতেই নিজেই যে এর একটি মালিক হয়েছিলাম , তাতে সন্দেহ নেই। আজ এতদিন পরে কথাটা উঠে এক জায়গায় একটু ধক্ষ লাগিয়ে দিল। জাপানের মাটি ছুঁতে -না-ছুঁতেই আমার জীবনে শুরু হয়েছিল কম্পিউটারের সঙ্গে লড়াই। দু বছরের ধাক্কা। মনে হচ্ছে এই প্রথম দু বছর পেরিয়ে তবেই কোনও সময়ে Fax-এর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ানোয় যন্ত্রটি কিনতে হয়েছিল। তবে কি Fax আবির্ভূত হয়েছিল সত্তরের দশকের মাঝামাঝি ?

সে সময়ে আমাকে জলপানি , অর্থাৎ স্কলারশিপ ভাঙিয়ে সংসার চালাতে হত। তার উপরে যৎসামান্য হাতে আসত প্রথমে ইংরিজি থেকে জাপানিতে , পরে জাপানি থেকে ইংরিজিতে এটা ওটা অনুবাদ করে। এমনই একটি অনুবাদ -সংস্থায় ইন্টারভিউ-এর জন্য ডাক পড়ার অপেক্ষায় বাইরে বসে আছি , হঠাৎ চোখে পড়ল একটু দূরে জনৈকা মহিলা কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা-চওড়া এক যন্ত্রদানবের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছেন। কারণটা কী বুঝলাম না , -- মনে হল মেরামত চলছে। কৌতূহল রয়ে গেল মনে। ইন্টারভিউয়ে এ-কথা ও-কথার পর কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন , আমার কোনও প্রশ্ন আছে কিনা। আমি জানালাম , স্বদেশে আমি কখনও কোনও স্ট্রীলোককে সামান্য একটা জলের কলও সারাতে দেখিনি। তাই বাইরের মহিলাটিকে ঐ রকম একটি কাজে নিযুক্ত দেখে আশ্চর্য হয়েছি। প্রশ্নকর্তারা মনে হল আরও আশ্চর্য হলেন আমার কথা শুনে। তারপর দরজা খুলে একবারটি বাইরে উঁকি মেরে এঁদেরই মধ্যে একজন সহাস্যে আমাকে জানালেন , মেরামত নয় , মহিলা কর্মীটি কী যেন টাইপ করছেন। আমি আরও বিহ্বল হয়ে কবুল করলাম , এমন বিপুলাকায় টাইপযন্ত্রের সঙ্গেও আমার কখনও সাক্ষাৎ হয়নি , আর আমার দেখা সব টাইপরাইটারেরই

ক্ষেত্রে দেখেছি লোকে সোজা হয়ে চেয়ারে বসে সেটির দ্বারা চিঠি টাইপ করে । শুনলাম বস্তুটি জাপানি ভাষার টাইপযন্ত্র । তার ব্যবহারবিধি জানতে চাইলে জানা গেল , শুধু কানা অক্ষরের (অর্থাৎ হিরাগানা অথবা কাতাকানার) টাইপরাইটারও আছে , কিন্তু বাইরে যেটিকে আমি দেখেছি , সেটিতে হাজার কুড়ি চিনা অক্ষরও মজুত আছে । এর যেটি যখন প্রয়োজন সেটিকে খুঁজে বার করে ছোট একটি চিমটে তথা হাতুড়ি জাতীয় বস্তুর দ্বারা কাগজে ছাপতে হয় । ব্যবসায়িক মহলে লিপিশিল্পীর কেন প্রয়োজন , সেই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম ।

অনেক প্রশ্ন নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলাম । পরদিন পড়ি-কি-মরি করে ছুটলাম বাড়ির অনতিদূরে একটি জাপানি ভাষায় টাইপ শিক্ষার ইন্সকুলে , যেখানে এর আগে কোনও বিদেশী প্রবেশ করেছে কিনা সন্দেহ । বিস্মিত শিক্ষক ভদ্রলোককে জানালাম আমি শুধু একটি কথাই জানতে এসেছি । আমাকে বলুন , একজন নিপুন টাইপিষ্ট আপনাদের ভাষার টাইপ যন্ত্রে সারাদিনে কত পাতা টাইপ করে নামাতে পারে । সঠিক মনে নেই , কিন্তু উত্তরে বোধহয় শুনেছিলাম ১০ পাতা ।

জাপানে যে কম্পিউটারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় , সেটি পার্সোনাল কম্পিউটারের আগের প্রজন্মের । প্রোগ্রাম লিখে তাকে কার্ডে তুলে সে কার্ডকে ঘর-জোড়া দৈত্যাকার কম্পিউটারের উদরে প্রবেশ করাতে হত তখন । সবই সেই a-b-c-d- । জাপানি নামগন্ধও নেই , কিন্তু প্রায় দু-বছরের মাথায় সহসা একদিন সাজসাজ রব শুনে গিয়ে দেখি , এর মধ্যে কবে কম্পিউটার কানা কানজি দুইই শিখে নিয়েছে । ভিড় করে দাঁড়িয়ে সংস্কার লোকজন একটি মেয়েকে একের পর এক শব্দ বলে চলেছে , আর অনতিকালের মধ্যে সেটি কানজি কানাতে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসছে ।

প্রসঙ্গত জানাই , আমি যখন জাপানে পৌঁছেছিলাম , ততদিনে সে দেশের বড় বড় ছাপাখানায় টাইপ-সেটিং-এর কাজে বৈদ্যুতিন মুদ্রনযন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছে । কিন্তু ছোটোখাটো ছাপাখানায় তখনও কর্মীরা হাতেরই উপর নির্ভরশীল । আরও উল্লেখ করি , গত মহাযুদ্ধের আগে জাপানে বা চিনে ছাপার কাজে কম্পোজ করার কাজটি সম্পাদিত হত সর্বত্রই হাতে । আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের ছাপাখানায় সত্তরের দশকে কম্পোজিটারেরা টুলে বসে কোলের উপর রাখা ট্রে থেকে একটি একটি করে অক্ষর তুলে তাকে ফ্রেমে আটকে মেশিনে পাঠাতেন দেখেছি । কিন্তু কোলের উপর রাখা সেই ট্রে-টির জাপানি/চিনা সংস্করণ ছিল একটি পুরো ঘর , যার চারটি দেওয়ালেই ছিল ছাদ থেকে মেঝে অবধি অজস্র তাকের বিস্তার । সেই তাকের খোপে খোপে থাকত হাজার কুড়ি পঁচিশ কি তারও বেশী অক্ষর । কম্পোজ করতে অক্ষর খুঁজতে হত ঘরের এ-মাথা থেকে অন্য মাথা অবধি হেঁটে নয় , প্রায় দৌড়ে । এই উপায়ে ছাপা খবরের কাগজও পরের দিন সকালে সূর্য উঠতে-না-উঠতেই পৌঁছে যেত গ্রাহকদের দরজায় । ধন্য চিন , ধন্য জাপান !

জাপানিদের আমি অনেক কারণেই শ্রদ্ধা করি , কিন্তু যে সংকীর্ণ গাঙের মধ্যে আমার চলাফেরা , সেখানে প্রথম সারিতে স্থান জাপানি word-processing program-এর । পৃথিবীতে জাপানী ভাষার মত এতো বিশৃঙ্খল লিখন পদ্ধতি আর কোনোও ভাষায়

আছে কিনা সন্দেহ । আমার চোখের সামনে সেই লেখাই একদা ধরা দিল জাপানি কম্পিউটার-গণিতজ্ঞদের জালে । কম্পিউটারে জাপানি ভাষার ব্যবহার তো এখন জল-ভাত ।

অর্থাৎ , কম্পিউটার জাপানি ভাষার লিপিকরণে যুগান্তর ঘটিয়েছে । কিন্তু সেইসঙ্গে মনে হয় এই যন্ত্রটিরই বহু বিস্তৃত কেরামতিতে লিপি নৈপুণ্য অর্জনের প্রতি সাধারণ জাপানির এই সে-দিনও যে-আগ্রহের অভাব ছিল না , তাতে কিঞ্চিৎ ভাটা পড়েছে । লিপিশিল্প হয়তো এর পরেও মানুষকে টানবে , যেমন , অনুমান , মানুষ নিজের আনন্দেই ছবিও আঁকবে । কিন্তু বাকি মানুষ স্বহস্তে লিখবে কি , আঁকবে কি ?

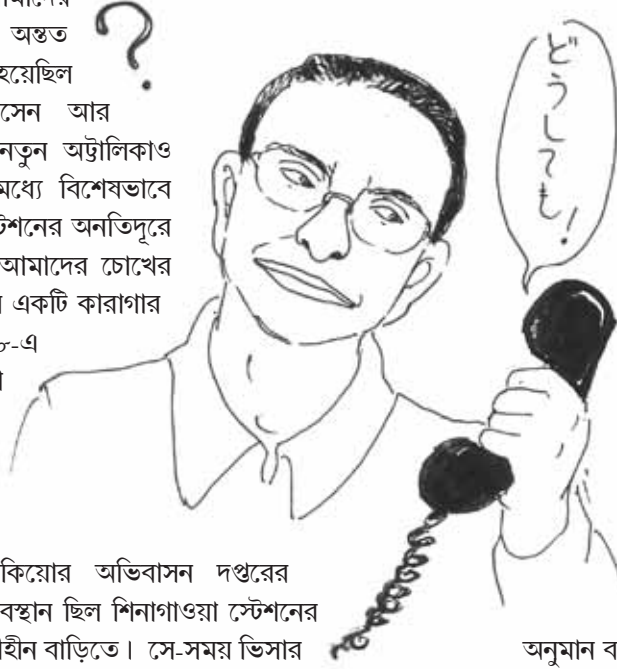
একেক সময় মনে হয় , আমার জীবনকালেই হয়তো হাতে কিছু লেখার প্রয়োজন অবলুপ্ত হয়ে যাবে । এমন কি রাস্তায় ঘাটে বন্ধু-বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করে তাদের ঠিকানা , পকেট-টেলিফোনের নম্বর ইত্যাদি নোটবুকে না লিখে , জ্ঞাতব্য তথ্যটি তথ্যদাতা / দাতার মুখনিঃসৃত হওয়া মাত্রই সরাসরি USB-তে নথিভুক্ত করে ফেলবে মানুষ ।

পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেরই হয়তো অজ্ঞাত যে অক্ষদের জন্য জাপানের শিক্ষা-মন্ত্রক নির্দেশিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কানজির কোনও স্থান নেই । অর্থাৎ , দৃষ্টিসম্পন্ন জাপানি ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার ক্লাশে যেখানে প্রথম শ্রেণী থেকেই কানা ও কানজি লিপি শিখতে শুরু করে , অক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সেখানে শুধুমাত্র কানা অক্ষরই ব্রেইল করতে শেখানো হয় । এদিকে , কানজি ছাড়া জাপান এক কথায় অচল । এই বস্তুটিকে বাদ দিয়ে একটা সাধারণ বক্তব্যও লিপিবদ্ধ করলে তা পড়তে গিয়ে পাঠকের হেঁচট খাওয়া প্রায় অবধারিত । এদিকে কানজি এবং কানা মিশিয়ে কোনও কিছুই কাগজে ফুটিয়ে তুলতে অপারগ জাপানের অক্ষেরা । এ জন্য তারা নানা বিড়ম্বনায় পড়ে , বলতে গেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের পর্যায়ভুক্ত হয়ে দাঁড়ায় । ঠিক মনে পড়ছে না , কিন্তু আজ থেকে বোধহয় বছর চল্লিশ আগে এই সমস্যাটির সমাধানে কানতো ও কানসাই অঞ্চলে যথাক্রমে হাসেগাওয়া সাদাও (নিজে অক্ষ) এবং কাওয়াকামি তাইইচি কানার পাশাপাশি কানজি ব্রেইল করার দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন । কয়েক বছরে এঁরা দুজনেই নিজ নিজ পদ্ধতিতে হাজার পনের কি তারও বেশী অক্ষর ব্রেইল করতে সক্ষম হন । এঁদের ছাত্রেরাও সোৎসাহে কানজি শিখতে শুরু করে ।

কিন্তু তারপর সহসা সবই বদলে গেল কম্পিউটারের কল্যাণে । এর বিশদ বর্ণনা দিতে গেলে ঠিক বর্তমান আলোচনায় আঁটানো যাবে না , তাই এটুকুই শুধু জানিয়ে রাখি যে এখন অক্ষ জাপানিরা (শুধু অক্ষেরাই নন বধিরাক্ষেরাও , অর্থাৎ যাঁরা একই সঙ্গে অক্ষ এবং বধির , তাঁরাও) কম্পিউটারের সাহায্যে কানজি-কানায় প্রয়োজন মতো সবই লিখে যাচ্ছেন ।

আমাদের বাস ছিল প্রথম থেকে শেষ অবধি টোকিয়ো শহরে । মার্কিনী বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে ঠাটা করে বলি , I surveyed Tokyo in depth । সহজ কথায় শহরটার উপরটার সঙ্গে যতটুকু পরিচয় ছিল , তার চেয়ে বেশি চিন্তাম ভূতলকে । অবাধ হবার কিছু নেই , যেহেতু গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে অধমের ক্ষেত্রে প্রধানত পাতাল

রেলগাড়িই ছিল বাহন। আমাদের টোকিয়ো প্রবাসের মধ্যেই অন্তত দুটি নতুন পাতাল রেল চালু হয়েছিল শহরে ; ইউরাকুচোও -সেন আর তোওএই শিনজুকু-সেন। নতুন অটালিকাও উঠতে দেখেছি , যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইকেবুকুরো স্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত সানশাইন-সিটি। আমাদের চোখের সামনে এটি নির্মিত হয়েছিল একটি কারাগার ভেঙে , যে কারাগারে ১৯৪৮-এ যুদ্ধকালীন সমর নেতা হিদেকি তোজোর মৃত্যুদণ্ড কার্যে পরিণত করা হয়েছিল।



সত্তরের দশকে টোকিয়োর অভিবাসন দপ্তরের (Immigration Office) অবস্থান ছিল শিনাগাওয়া স্টেশনের অনতিদূরে , একটি অতীব শ্রীহীন বাড়িতে। সে-সময় ভিসার মেয়াদ বাড়ানো সহজ ছিলনা। তার জন্য আবেদন জানিয়ে অপেক্ষা করতে হত উত্তরের। একবার মাস তিনেক পরেও ও-দিককে নিঃশব্দ দেখে শেষ পর্যন্ত কম্পিতবক্ষে টেলিফোন করে ফেলেছিলাম। ফল কী হয়েছিল নিবেদন করার আগে কয়েকটা কথা বলে নিতে হবে।

ভাষাবিজ্ঞানী মারিও পেই তাঁর একটি সর্বজন - সুপাঠ্য বই-এ লিখেছিলেন , শব্দ বা বাচনভঙ্গী (expression) আয়ু ব্যাপারটা মানুষেরই আয়ুর মত , কেউ অনেক জৌলুস নিয়ে উদয় হলেও দু দিনেই ঝরে যায় , কেউ বা টিকে যায় বহুকালের জন্য। আম জনতার জবানে পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও হয়তো বা প্রতিদিনই নতুন শব্দ জন্মাচ্ছে। জাপানও অবশ্যই এর ব্যতিক্রম নয়। প্রতি বছরই ৩১ শে ডিসেম্বর নবজাত এ-জাতীয় অভিভ্যক্তির একটি তালিকা বার করত জাপানি সংবাদপত্র আসাহি-শিন্বুন (এখনও করে কিনা ঠিক জানিনা)। এ রকম দুটি শব্দ আমাকে যৎকিঞ্চিৎ ভুগিয়েছিল। প্রথমটি 'নান চাত্তে' , দ্বিতীয়টি বিশেষ প্রয়োগে 'দোও শিতে মো'। দুটির কোনওটিরই অর্থ আজও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এরা এই ২০০৯-এ সচল কিনা তা-ও আমার অজ্ঞাত।

প্রথমটি তেমন কিছু দোষের নয় , আমার নিজের ধারণা এটি একটি interjection , তবে বিশেষ অর্থবহ নয়। যার কাছে যে প্রশ্নের উত্তর আশা করা যায়না , তাকেই সে-প্রশ্ন করে , 'কিরে , হেরে গেলি তো ?' গোছের কিছু মন্তব্য করতে হলে কাউকে কাউকে জাপানিতে এই 'নান চাত্তে' ব্যবহার করতে শুনেছি। দ্বিতীয়টি সাধারণত 'কিছুতেই' (যেমন 'কিছুতেই হবেনা') অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেই ১৯৭৫-৭৬এ লোকের মুখে এটি শোনা যেত একটু অসাধারণ প্রয়োগে।

অভিবাসন দেবতাদের টেলিফোনে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম , কেন এত দেরী হচ্ছে আপনাদের জবাব পেতে। উত্তর এসেছিল , 'গণ্ডগোল আছে।' অতঃপর আমার প্রশ্ন - কি কারণে (দোও শিতে) ? উত্তর - 'দোও শিতেমো'। বাংলায় টেনেটুনে হয়তো 'যে - ভাবেই ভাবা যাক না কেন।' আমার অবশ্য ধারণা , দপ্তরের কর্মীটি প্রশ্নকারীর 'দোও শিতে'-র পিঠোপিঠি একটা অর্থহীন জবাব দিয়ে তাকে ভূমিসাৎ করতে চেয়েছিলেন।

ভিসা কিন্তু তারপর কিছুদিনের মধ্যেই পেয়ে গিয়েছিলাম। আরও উল্লেখ্য , অভিবাসন দপ্তরও এরপর অনুমান বছর দুয়েকের জন্য উঠে যায় সানশাইন সিটি ভবনে। সে সময়ে দপ্তর থেকে বেরিয়ে এধারে ওধারে সুসজ্জিত দোকানপাট দেখতে দেখতে বাইরের রাস্তায় পড়ার আগেই মনের সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে যেত।

এখনও মাঝে মাঝে টোকিয়োয় গেলে বিপুল পরিবর্তন দেখি। পূর্বপরিচিত অনেক কিছুই আজ দেখি অবলুপ্ত। অন্যদিকে শিনাগাওয়া স্টেশনে ১৯৯২-এর প্রায়াক্ষকার কোওনান বহির্গমন পথ এখন আলোকিত , স্টেশনের ভিতরেও সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য দোকান , দিনের শেষে ঘরমুখি মানুষের ভিড়। এমন পরিবর্তনে মনটা ভরে যায়।

হয়তো বা একটু অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা মনে পড়ে গেল। বছর কয়েক আগে কলকাতার একটি ব্যাংকে কিছু কাগজে দস্তখৎ করার প্রয়োজন হয়েছিল। ব্যাংকে যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল , আমার সহই দেখে তিনি শিউরে উঠলেন , একি , এ তো দেখছি একেবারে বদলে গিয়েছে ! চার দশক আগে নিজের হস্তাক্ষর কেমন ছিল তা কি ছাই আর মনে আছে ? সবিনয়ে নিবেদন করেছিলাম , আঙু , মানুষটাই তো বদলে গিয়েছে , সহ-এর আর দোষ কি ?

বেরিয়ে এসে মনে হয়েছিল , কথাটা কি ঠিক বললাম ? সত্যিই কি বদলে গিয়েছি ? আচার ব্যবহারে , চেহারায় যেটুকু পরিবর্তন ধরা পড়ছে , তার সম্ভাবনা নিয়েই কি একদা ভূমিষ্ঠ হইনি ? হয়তো মানুষের ইতিহাস জুড়েই যে পরিবর্তন নিয়ত সংঘটিত হয়ে চলেছে , তার বীজ সৃষ্টির আদিতেই উগু হয়েছিল। কে জানে , হয়তো কালের বুকু আমাদের সব পরিবর্তনেরই সঞ্চারণ পথ আঁকা আছে , অজান্তে সেই পথেরই অলঙ্ঘনীয় , অনিবার্য নিয়মে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে অবিপ্রাম আমাদের গতি। ৯

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে

শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

একটা করে দানা দিই আর মাছগুলো কেমন বড় বড় হাঁ করে কপ্ করে গিলে ফেলে। ছোটবেলায় দাদুর হাত ধরে মাঝে মাঝেই যেতাম ঢাকুরিয়ার লেকে। আর আমাদের দু বোনের আনন্দ ছিল ওটাই -- মাছকে খাওয়ান। রোদ পড়ে আসতেই বাড়ি যাবার তাড়া দিতেন দাদু। আমারও আবার বাড়ীর দিকে রওনা হতাম দাদুর সঙ্গে। কানে ভেসে আসত ঘন্টা আর কেমন অদ্ভুত একটা ড্রামের শব্দ। পথের ডান দিকে একটা মন্দির পড়ত। ওখানেও আমাদের যাওয়া চাই-ই চাই। এখানে অব্যাহত দ্বার। অনেকেই এসে বসতেন। পূজো দেখতেন। আমরা হাঁটু গেড়ে বসতাম পুরোহিতদের দেখা দেখি। ওঁরা কেমন অজানা ভাষায় কথা বলতেন, মন্ত্র পড়তেন। কানে গেলেও তা উদ্ধার করতে পারতাম না আমরা। কেবল দাদু বলতেন এটা জাপানী মন্দির, ওঁরা জাপানী ভাষায় মন্ত্র পড়েন। আমরা হাত জোড় করে প্রণাম করে আবার দাদুর হাত ধরতাম।

বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য ১৯৩১-এর ১৬ই জানুয়ারী জাপান থেকে গুরু নিচিরেন আসেন কোলকাতায়। আশ্রয় নেন এক গুরুদ্বারে। বুদ্ধের নামগান গাইতে গাইতে তিনি হাঁটতে থাকেন শহরময়। ১৯৩৩-এর ৪ঠা অক্টোবর ওয়ার্ধায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় মহাত্মা গান্ধীর। গুরু নিচিরেনের স্তোত্র শুনে খুশী হন মহাত্মাজী। গুরু নিচিরেন গান্ধীকে বললেন তাঁর অহিংসায় বিশ্বাস আর বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে কত মিল। নিচিরেনের অনুগামীরা পরোক্ষ অনুপ্রেরণা দিতে থাকলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে। এরপর রাজা বলদেও দাস বিড়লার পুত্র যুগল কিশোর বিড়লা, জাপানী বৌদ্ধগুরু নিচিদাৎসু ফুজি-কে লেকে প্রায় দু বিঘা জমি দান করেন। সেখানেই শুরু হয় এই মন্দির তৈরির কাজ। শেষ হয় ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারীতে। মন্দিরে গোড়া থেকেই পূজারীর দায়িত্ব পান জাপানী কোনো প্রবীণ ভিক্ষু। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে বৃটিশরা জাপানীদের ভারত ছাড়ার নির্দেশ দিলে সমস্যা দেখা দেয়। প্রশাসন নাকি এই মন্দিরটি নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। নিচিদাৎসু-র অন্যতম শিষ্য স্বামী

ধীরানন্দ শাস্ত্রী এই চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। মন্দিরটি থেকে যায় জাপানী বৌদ্ধদের হাতেই।

কয়েক বছর আগে এক সকালবেলায় গিয়েছিলাম ওই মন্দিরে। ছোটবেলায় কথা ঘুরেফিরে মনে আসে। দাদু আজ আর এই পৃথিবীতে নেই। তোলপাড় হয় মনটা, বসি হাঁটু গেড়ে ঠিক সেই আগের মত করে।



মন্দিরের বাইরে চাতালে দেখা হয় ২২/২৩ বছরের এক জাপানী যুবকের সঙ্গে। কথায় কথায় জানতে পারি প্রায় এক বছর হল ও এখানে আছে। বললাম,

‘কেমন লাগছে এই শহর?’ উত্তরে বলে, ‘অনেক অসুবিধে আছে ঠিকই, কিন্তু একটা অদ্ভুত টান আছে এই শহরটাতে। কিছুতেই ফিরতে পারছি না।’ বৃকের ভিতর একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যায় আমার।

গত বছরের ডিসেম্বরে আবার গিয়েছিলাম ওই জাপানী মন্দিরে মিওহোউজি। এবার আমার কয়েকজন জাপানী বন্ধু নিয়ে। পূজো হয়ে গেছে। আমরা গিয়ে বসলাম। পুরোহিত এলেন। আমাদের দেখে খুব খুশী। কোলকাতায় অনুষ্ঠান করতে এসেছি জেনে তার সাফল্য কামনায় আবার আমাদের জন্য পূজো করলেন। এসে বসলেন আমাদের মধ্যে। ৬ বছর এই মন্দিরে আছেন। ৭২ বছর বয়স। মিঃ সাইতো বা সাইতো মহারাজ। একথা সেকথার পর এবার আমাদের ফেরবার পালা। উনি আমার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘দেশে ফিরে এরপর যার সাথেই দেখা হবে, বোলো একবারের জন্য হলেও যেন ভারতবর্ষ দেখে যায়। ভারত ভ্রমণ না হলে মানব-জন্ম সার্থক হয় না।’



পা বাড়াই বাড়ীর পথে। ‘নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।’ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছি এগিয়ে চলি ঢাকুরিয়া ব্রীজের নীচ দিয়ে। ॐ

প্রবাসের চিঠি

মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত)



শরতকাল, টোকিও
প্রিয় স্বাতী,

হঠাৎ আমার এই চিঠিটা পেয়ে খুব অবাক হচ্ছি জানি, আর এও জানি আকাশ-পাতাল হাতড়ে বেড়াচ্ছি কি হল ভেবে। কারণ মাত্র দিন কয়েক আগেই ফোনে কথা হয়েছে আমাদের। আসলে মনটা বড় অস্থির হয়ে আছে। আর এসব সময় ঘুরেফিরে খালি তোর কথাই মনে হয়। সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে আমরা সবকিছু নিয়ে আলোচনা বা পরামর্শ করছি। প্রয়োজনে অপয়োজনে একে অন্যের কাছে হাজির হয়েছি মতামত জানতে বা জানাতে। কাছে থাকলে আজও সেই পুরোনো দিনগুলির মতন ছুটে চলে যেতাম তোর কাছে। বসে বসে অনেক কথা বলে, অনেক গল্প করে, মনের সব ভার নামিয়ে ফিরে আসতাম নতুন উদ্যমে দৈনন্দিন জীবনের হাঁপ ধরা একঘেয়ে বাঁধাধরা রুটিনের আবর্তে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। দূরত্বটা বড়ই বেশী বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের মাঝখানে। অবশ্য আবার ফোন করতে অসুবিধা ছিল না। কেমন যেন মনে হল চিঠিতেই সব কথা বলা সহজ হবে।

যাক, এবার যে কারণে এই চিঠি লেখা তাতে আসি। জানিস, যেদিন তোর সঙ্গে শেষবার কথা হল ফোনে (ক'দিন আগে আর কি!) , সেই রাতেই স্বপ্নের মধ্যে এসে হাজির রীণা। সেই হাসিতে ভরা ঝলমলে মুখ আর দুটুমীতে ভরা বড় বড় দুটো চোখ। স্পষ্ট শুনতে পেলাম ওর গলায় আমার নামের সেই নামাবলী -- যা আমার পিছনে লাগার জন্য তৈরি করেছিল। তোর সেটা নিশ্চয়ই মনে আছে। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই চলে গেল। আচ্ছা, এতদিন পরে ও হঠাৎ এল কেন বলতো? আর এলই যদি, তবে দেখা দিয়েই চলে গেল কেন? ঠিক যেন এক ঝলকের জন্য উঁকি মারা। চলতে চলতে পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় বিদেশী কায়দায় 'হাই' বলার মতন। বুঝে উঠতে না উঠতেই সব শেষ। এর কোনো মানে হয়? আমি তো সজ্ঞানে ওর কথা ভাবিনি এর মধ্যে। তবে কি সেই কথাই মনে করতে এসেছিল? ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসেছিলাম বিছানায়। চারদিকে তাকিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই -- তবু যেন আছে। সেই অনুভূতির রেশটা বেশ কিছুক্ষণ ছিল। সে রাতে আর ঘুম আসেনি। মনটাও কেমন যেন হয়ে আছে সেই থেকে। একটা বিষণ্ণভাব (অপরাধ বোধ?) সারা মন জুড়ে বসেছে। কিছুই ভাল লাগছে না। কোনো কাজও করতে পারছি না ঠিকমতন। আর তারপর থেকেই তোকে চিঠি লেখার তাড়াটা অনুভব করছি। তুই ছাড়া কাকেই বা বলি এসব কথা? কেই বা বুঝবে আর বিশ্বাস করবে? এমনিতেই থেকে থেকে কারণে অকারণে মন উন্মনা হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শরতকাল এলে। চারদিকে যখন পুজো পুজো ভাব, তখন এত বছর পরেও মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কত কষ্ট করে যে নিজেকে সামলে রাখতে হয় তা আমিই জানি। রীণাটা তা আরো বেশী করে উস্কে দিয়ে গেল।

তোকে আর একটা খবর দেবার আছে। তোকে কি বলেছি অতীত জ্বরে ভগছি ইদানিং? সত্যি কথা বলতে কি, পিছন ফিরে ফেলে আসা দিনগুলির কথা ভাবতে বড় ভাল লাগে এখন। কত

স্মৃতি যে মনের কোনায় ভীড় করে আসে! সেই সঙ্গে ফিরে ফিরে আসে টুকরো টুকরো কত ঘটনা। পুরোনো চিঠির ঝাঁপি নিয়ে বসি যখন (তুই জানিস আমি চিঠি ফেলতে পারি না -- সব জমা আছে), রাতের পর রাত কেটে যায় একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে। রাতের নিস্তব্ধতায় আরো নিবিড়ভাবে অনুভব করি সব কিছুকে। অতীতচারণেরও একটা আনন্দ আছে, তা এমনভাবে আগে কখনো বুঝি নি। মনের বেহাল অবস্থায় এটা বেশ ভাল টনিকের কাজ করে। মনের রাশ ছেড়ে দিই যথেষ্ট ভ্রমণে। সে চোখের পলকে পৌঁছে যায় ফেলে আসা সেইসব দিনগুলিতে। মনে হয় এই তো সেদিন কলেজ জীবনে হৈ হৈ করে, আনন্দ করে, রঙ্গীন স্বপ্ন দেখে দিনগুলি কাটলাম। দেখতে দেখতে কতগুলি বছর কেটে গেল বলতো? কিছু কিছু ঘটনা বেশী করে দাগ কেটেছে মনের মধ্যে। ঘুরে ফিরে তা মনে পড়ে। আর এক একাই উপভোগ করি তা চাবিয়ে চাবিয়ে।

তোর মনে আছে চৌধুরী বাড়ীর সেই মেয়েটির কথা? কেন জানি না থেকে থেকেই তার কথা মনে হয়। কি যেন নামটা? আজ আর মনে পড়ে না। তবে ওর হাবভাব দেখে আমরা ওর নাম দিয়েছিলাম 'বেদিশা'। কলেজ যাবার সময় আমাদের একটা স্টপ পরে মোড়ের মাথা থেকে উঠত। আমাদের দেখলেই কেমন যেন কুকুড়ে যেত। এড়াবার চেষ্টা করত সব সময়। কেন কে জানে? মনে পড়ে একবার আমরা তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করাতো তার কি অবস্থা! পালাতে পারলে বাঁচে। আমরা কি এতই ভয়াবহ ছিলাম? অথচ সে আমাদের পাড়ারই মেয়ে ছিল। অবশ্য ওদের বিরাট একাধিক বনেদী পরিবারের মেয়েরা স্কুল-কলেজে যাতায়াত করা ছাড়া বিশেষ বাইরে বেরোতনা। পাড়ার কারুর সঙ্গে তেমন মেলামেশাও ছিল না। আরো অবাক লাগে এতদিন পরেও এই ভেবে যে সে শুধু এক পাড়ার মেয়েই ছিল না -- একই কলেজের, একই ক্লাশেরও ছিল। কলেজেও যে তার অনেক বন্ধু ছিল তা-ও না। একা একা থাকতেই দেখেছি বেশী। আজ সে কোথায়, কে জানে! তারও কি আমাদের কথা মনে হয় কখনো?

মনে পড়ে যায় পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে কলেজে যাবার দিনগুলি। দলে আমরা কম জন ছিলাম না। ক'জন যেন? প্রথমে রীণা, তুই আর আমি একসঙ্গে বেরোতাম। তারপর একে একে যোগ দিত রাই, বৈশাখী, অতসী, প্রমিতা আর তাপসী। রীণা, রাই আর প্রমিতা এই তিনজনের দৌলতে দলটা খুব প্রাণবন্ত ছিল, তাই না রে? আর রীণাটার মাথায় খেলত যত রকমের দুট্টুবুদ্ধি, কখনো কারুর নাম দিচ্ছে, কখনো বা অন্য কিছু নিয়ে পিছনে লাগছে। মনে আছে মিতালীর নাম হয়ে গেল 'গন্ধ', কারণ বেচারী বলেছিল কাদের সঙ্গে যেন ওদের আত্মীয়তার গন্ধ আছে। ব্যাস, আর যাবে কোথায়! পারতও বটে! কলেজে ছিল আরো কিছু বন্ধু, সব একসঙ্গে হলে দলটা আরো বড় আর ভারী হত। নিয়মিত বন্ধুরা ছাড়াও অন্যান্য মেয়েরা এসে যোগ দিয়েছে কত সময়। তাতে দলের ভার আরো বেড়েছে -- সেই সঙ্গে গুরুত্বও। আমাদের বিরাট দলটাকে সারা কলেজ চিনত। কলেজ ক্যানটিনের বিশাল

ঘরটার একটা কোনায় ছিল আমাদের চিরস্থায়ী সংরক্ষিত আসন। ভাবতে অবাক লাগে, সে জায়গা দখল করার চেষ্টা কেউ কোনোদিন করেনি। এমন কি আমাদের উপরের ক্লাশের দিদিরাও না। বরং তাদের স্নেহ মাখান প্রশ্রয়ই ছিল দলটার জন্যে। আজকাল যখন র্যাগিং-এর ঘটনা শুনি, তখন ভাবি আমরা কত ভাগ্যবান ছিলাম। সেই সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সেখানটা থাকত হৈ চৈ-এ ভরা। যে যার ক্লাশের সময় চলে যেত -- কেউবা প্রক্সির ব্যবস্থা করে ফিরে আসত। আমরা তো শুধু নিরলস আড্ডা মেরেই সময় কাটাইনি। কলেজের নানান অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আলোচনা থেকে শুরু করে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদের নানা ব্যবস্থাও সেখানে হয়েছে। অনেক সময় অন্যান্য ছাত্রীরাও নানারকম পরামর্শ দিতে এসেছে। তখন তো কলেজ ইয়ুনিয়ন করা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। আমাদের দলের মধ্যেও দুই এক জন ছিল যারা ইয়ুনিয়ন করত। কিন্তু তাদের মুখ খোলার উপায় ছিল না রীণা, রাই আর প্রমিতার দাবড়ানির ভয়ে। আমরা নিজেদের এসব থেকে দূরে রাখার চেষ্টাই করতাম। তবু জড়িয়ে পড়েছি কোনো না কোনো সময়ে নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

আর সেই শনিবারের দিনগুলি? বেশীর ভাগ সময়ই কোনো ক্লাশ থাকত না আর থাকলেও তেমন দরকারী কিছু না -- অর্থাৎ না গেলেও ক্ষতি ছিল না। আমাদের ক্লাশ না থাকলেও অনেক বন্ধুদেরই থাকত। অগত্যা আমরাও সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মতই হাজিরা দিতাম নির্ভাভরে শুধুমাত্র বন্ধুদের সঙ্গে পাবার লোভে। আমাদের সময়ে তো আর এখনকার মেয়েদের মতন যখন তখন বাড়ীর বাইরে বেরোবার স্বাধীনতা ছিলনা। পড়াশোনা নিয়ে আপত্তি না থাকলেও বন্ধুদের সঙ্গে বেরোনো, বিশেষ করে আড্ডা মারার ব্যাপারটা অনেক বাড়ীতেই পছন্দ করা হত না। তাই যেন তেন প্রকারেণ একটা উপায় বার করতেই হত যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে, অর্থাৎ অভিভাবকেরা যেন কোনোরকম বাধা দিতে না পারেন। কলেজের মতন বিশ্বস্ত জায়গা আর কোথায় হতে পারে? আমরা তাই শনিবারটা কাজে লাগাতাম। অবশ্য আমরা কলেজেই যেতাম, অন্য কোথাও নয়। তবু ভয় মেশান একটা অস্বস্তি থেকে যেত মুক্তির স্বাদের সঙ্গে। ক্লাশের তাড়া না থাকতে আমরা ঐ দিনটা দল বেঁধে গল্প করতে করতে হেঁটে যাতায়াত করতাম কলেজে। ঘন্টাখানেকের পথ নিমেষে যেন শেষ হয়ে যেত। ভীড় এড়াতে আমরা বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ভিতর দিকের রাস্তাগুলি ধরতাম। তাতে সময়ও কিছুটা কম লাগত। বাসস্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে ছিল কাপুরদের ফ্যান্সি স্টোর। তার গা ঘেঁষে যে রাস্তাটা (নাম মনে পড়ছে না), সেটা দিয়ে পথের শর্টকাট শুরু হত আমাদের। তোর মনে আছে কাপুররা তিন ভাই ছিল, আর তিন জনেই কি সুন্দর দেখতে ছিল! তেমনি ভদ্র ব্যবহার। ছোট ভাইটা ছিল সব থেকে সুন্দর আর সে ব্যাপারে সচেতনও। কতই বা বয়স ছিল তার। আমাদের থেকে সামান্য বড়। আমাদের যাবার সময়টাতে দোকানের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ঠিক যেন কেউ ঠাকুরটি। আমরা রাই-কে ক্ষেপাতাম (রাই নাম বলেই) “ঐ দ্যাখ, তোর কেউ ঠাকুর দাঁড়িয়ে তোর জন্যে।” কি ক্ষেপেই না যেত! আর কাপুরদের সেই ভাই আমাদের কাছে কেউঠাকুর হয়েই রয়ে গেল।

শনিবার বলে কলেজ তাড়াতাড়ি শেষ হত। আমাদেরও বাড়ী ফিরতে খুব একটা দেরী হত না। ফেরার পথে আবার আরেক দৃশ্য আমাদের অপেক্ষায়। একটা বাড়ীর সামনে রকে বসে থাকা ছেলের দল যেন আমাদের প্রতীক্ষাতেই থাকত। তোর মনে আছে, তাদের চেহারা, সাজগোজ, কথাবার্তা সবই ভদ্র ছিল। বখা ছেলে, বা

চ্যাংড়া বলতে যা, তা কিন্তু তারা ছিল না। আজ বাজে কথা বা মন্তব্য কিছুই ছিল না। তারা শুধু গান শোনাত। তাদের মধ্যে দুটো ছেলের গলা বড় সুন্দর ছিল। কত গান যে আমাদের শুনিয়েছে -- হিন্দী, বাংলা, পুরোনো গান, নতুন গান - কত রকমের! কোনো কিছুই বাদ যায় নি। কাকে উদ্দেশ্য করে গাইত, কে জানে। হয়ত বিশেষ কারুর জন্যে নয়। বয়সের ধর্মে শুধুই দুষ্টিমি করার জন্যে গান বেছে নিয়েছিল। আমরা মিথ্যেই ভাবার চেষ্টা করতাম কার জন্যে এত আকুলতা! ছেলেদুটির নাম মনে আছে -- অত্র আর আবীর -- দুই ভাই। চেহারা খুব মিল ছিল দুজনের। মাঝে মাঝে কখনো তারা গরহাজির থাকলে সেসব দিনগুলিতে গান আর তেমন জমত না। আমাদের বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগত, তাই না রে?

এখন অনেক সময় ভাবি মেয়েদের পিছনে লাগার এই যে একধরণের রেওয়াজ ছিল তখন, এখনকার তুলনায় তা কত সভ্য, কত মনোরম। যদিও তখন তাকে ‘চ্যাংড়ামি’ আখ্যাটাই দেওয়া হত।

কলেজের বন্ধু হিসেবে কত সব মেয়েদের সঙ্গে পেয়েছি। আজ তাদের কারুর মুখ মনে আছে তো নাম মনে নেই। আবার কারুর নামটা মনে আছে, কিন্তু মুখটা ঝাপসা হয়ে গেছে। সেই সব বন্ধুদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজনের সঙ্গে এখনো যোগাযোগটা রয়ে গেছে কিছুটা অনিয়মিত হলেও। পাড়ায় আমাদের যে দলটা ছিল, তার মধ্যে থেকে রীণা, অতসী আর বৈশাখী তো সময়ের বহু আগেই সংসারের পাট চুকিয়ে সাত তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়েছে। কিসের এত তাড়া ছিল ওদের কে জানে! জীবনে মৃত্যুর সত্যতা আছে, তা জানি। তবু মনটা যেন মানতে চায় না। ভাবলে পরে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। আচ্ছা বলত, পুনর্জন্ম কি সত্যিই আছে? তাহলে আবার কি দেখা হবে সকলের সঙ্গে স্কুল-কলেজের দরজায়? নাকি পাড়ার মোড়ে? আবার কি সকলে বাঁধা পড়ব বন্ধুত্বের বাঁধনে। বাকিদের সঙ্গে যোগাযোগটা যেন থাকে, সেটাই ভাবি সব সময়। বিশেষ করে তোর সঙ্গে। আমাদের পরিচয়টা কি আজকের? সেই কবে প্রথমে পরিবারে পরিবারে বন্ধুত্ব। তারপর আমাদের। আমাদের ছোটবেলায় তো নার্সারী বা কিণ্ডারগার্টেন-এ যাবার চল ততটা ছিল না। তাই একটু বড় হয়ে স্কুলে, আর সেখান থেকে টানা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে। ভাগ্যক্রমে একই ক্লাশে। তারপরও তো কত বছর কেটে গেল।

জীবনটাকে অনেক দেখলাম, বুঝলাম, চিনলাম এর মধ্যে। ভাল-মন্দ সবারকম অভিজ্ঞতায় ভরপুর তা। চার্বাকের মতানুসারে, যদি এ জীবনটাই শুধু সত্য হয়, তবে আজ কি হিসাব-নিকাশের সময় এসেছে -- কি পেয়েছি আর কি পেলাম না, তা খতিয়ে দেখার? কিন্তু মন তো তাতে রাজী নয় একেবারেই।

অতীতচারণ করার আনন্দের সঙ্গে মনের কোনো একটা কোনায় ব্যথাও লাগে এই ভেবে যে কোথায় চলে গেল সেসব দিনগুলি? আর একবার কি পাওয়া যায় না হাতের মুঠোয় সেই আনন্দঘন মুহূর্তগুলিকে? “আমাদের গেছে যেদিন -- একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি? রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।”

আজ এই পর্যন্ত। অনেক পুরোনো কথা লিখে তোকেও বোধহয় অতীত জ্বরের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিলাম। আবার ফোনে কথা হবে। ভাল থাকিস্।

ভালবাসা আর শুভেচ্ছায়
উর্মি

২৫

খুঁজে মোর গাড়ীর চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে

ভাস্বতী ঘোষ (সেনগুপ্ত)

ঘন সবুজ জঙ্গল ও পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পথ চলেছে। তার মাঝে আলোছায়ার খেলা। শান্ত সমাহিত প্রকৃতি -- মাঝে মাঝে শুধু খরস্রোতের বয়ে যাওয়া ও পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ার শব্দ। বেশ কিছুক্ষণ একনিব্বিষ্ট হয়ে শুনলে মনে হয় যেন এরই সাথে ঝাঁ ঝাঁ পোকাকার গানও মিশে আছে। পাকা রাস্তার পাশেই কাঁচা মাটির পথ জলপ্রপাতের উৎস পর্যন্ত চলে গেছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে আরও কিছুক্ষণ বাকি। আকাশে হঠাৎ মেঘের সূচনায় মনে হচ্ছে সন্ধ্যা হতেই ঝিরঝিরি বৃষ্টি শুরু হবে। মৃদু হাওয়ায় পাহাড়ী ফুলের পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়ছে। সব মিলিয়ে এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

শিরাইতো নো তাকি জলপ্রপাত সতিই যেন অসংখ্য সাদা



সূতোর গুচ্ছ।
পাহাড়ের
গা বেয়ে যে
জলরাশি
পড়ছে, তা
নাকি ৬ বছর
আগের বৃষ্টির
জল যা
পাহাড়ের গা
বেয়ে ধীরে

ধীরে বয়ে আসছে। কারুইজাওয়ার এই জলপ্রপাত দর্শনীয় আর আমরা প্রকৃতির এই সৌন্দর্যে একেবারে অভিভূত। জলপ্রপাতের কাছে জলের তাপমাত্রা ১১ দশমিক ৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সেই জলই নীচে এসে ঝর্ণার মতো বয়ে চলেছে এবং যথেষ্ট শীতল হয়েছে।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমার স্বামী সরীসৃপের মতো শুয়ে পড়ে কি যেন একটা করছে -- “একি! একি! কি করছো?” শুনলাম জল কতটা ঠাণ্ডা সেটাই নাকি দেখার চেষ্টা করছে বিশ্ব ও টিয়া। এই জলপ্রপাতের রাস্তার ধারে ছোট ছোট তিন চারটে দোকান -- খাবার, উপহারসামগ্রী ও পোড়ানো ছোট মাছ বিক্রি হচ্ছে।



মিষ্টি জলের
মাছ, তাই খুব
সুস্বাদু। সাথে
মিষ্টি আলু
পোড়া ও কিছু
পানীয়
রয়েছে।
এছাড়া
পাহাড়ের
পাথর

কেটে তাতে ছোট ছোট মেপল ও মস তৈরি করা হয়েছে।

সেগুলিও বিক্রি হচ্ছে। জানা গেল যে এই পাথরে লাগানো গাছ থেকে যা অর্থ উপার্জন হয়, সেই অর্থ সমাজকল্যাণমূলক কাজে লাগে। এই পাথরে উদ্যানগুলি জাপানী সৌন্দর্যবোধের প্রতীক।

প্রথমে আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ। তারপর গরম গরম মাছ পোড়া খেয়ে ও বাকি সব পরিদর্শন কোরে পরিতৃপ্ত। সেই সময় ঠিক হল এবার তাহলে আমরা মাউন্ট আসামা দর্শন করে আসি। সেই মুহূর্তেই ছন্দপতন! “একি! গাড়ীর চাবি কোথায়?” বিশ্বর হঠাৎ প্রশ্নে হৈ চৈ বেঁধে গেল। সকলেই যে যার ব্যাগ ভাল করে খুঁজলাম, কিন্তু চাবি তো বিশ্বই রেখেছিল ওর জ্যাকেটের পকেটে! যেই মনে পড়েছে অমনি দৌড়। ঐ জলপ্রপাতের রাস্তায় বা আশেপাশে কোথাও চাবি পড়ে আছে কিনা দেখার জন্য বিশ্ব, টিয়া ও দীয়া ছুটলো। ওদের সাথে ঐ সব ছোট দোকানের জাপানী বিক্রেতারাও যোগ দিল। সকলে দোকান ছেড়ে ঐ চাবি খোঁজাতে সাহায্য করতে ব্যস্ত -- সে এক দেখার মত দৃশ্য! ঐ রাস্তায় যেহেতু খুব বেশী যানবাহন চলাচল করে না, তাই দোকানে ওদের ব্যস্ততা কম। সপ্তাহের মাঝখানে খুব কম টুরিষ্টই আসে।

এর মাঝে বিশ্বর মনে পড়লো যে ও শুয়ে পড়ে জলপ্রপাতের পাড় থেকে জল ছোঁওয়ার চেষ্টা করছিল। অতএব সেইখানে আরেকবার শুয়ে পড়ে চাবি খোঁজার চেষ্টাও হল। কিন্তু ঐ খরস্রোতের মাঝে যদি চাবি পড়ে তাহলে জলের দুর্দাম গতিতে সেটার এখন ওইখানেই পড়ে থাকা সম্ভব নয়। সেই চাবি এতক্ষণে অনেক দূরে পৌঁছে গেছে অথবা কোথাও কোনো পাথরের আড়ালে আটকে গেছে যা খোঁজা অসম্ভব। তাতে প্রাণের আশংকা থাকবে -- এই কারণে কিছুই করা গেল না।

ঐ মায়াবী পরিবেশ থেকে আমরা এক নিমেষে কঠিন বাস্তবে ফিরে এলাম। এবারে কি করা হবে? গাড়ীতে আমাদের জিনিসপত্র, হোটেলের ঘরের চাবি ইত্যাদি রয়েছে এবং আমরা কাওয়াসাকি থেকে ঐ গাড়ী ভাড়া করে কারুইজাওয়া এসেছি। ছোট পাহাড়ী অঞ্চলের লোকজন আমাদের সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ দিনের শেষ বাসটিরও সময় হয়ে আসছে। তাই ঠিক হল যে আমরা ঐ বাসে কোরে অন্ততঃ হোটেলে ফিরি, তারপর গাড়ীর ব্যবস্থা ও চাবির ব্যবস্থা করা যাবে। পাহাড়ের গায়ে অন্ধকার হয়ে আসছে, পোকামাকড়েরা তাদের কাজে নেমে পড়েছে। আমাদের মতো নতুন মানুষদের পেয়ে তারা বেশ খুশী। ঠিক তখনই বাস এল। চাবি হারানোর চিন্তায় পরিশ্রান্ত আমরা সকলে বাসে উঠে পড়লাম হোটেলের উদ্দেশ্যে।

কারুইজাওয়া, ৪ঠা জুন ২০০৯

২



কেই

নাওকি পুরস্কার প্রাপ্ত জনপ্রিয় জাপানী লেখক তাকাশী আতোদার The Honey Flower গল্পের অনুবাদ ।

তানিয়া রায় ভট্টাচার্য্য

যে গল্পটা বলতে চলেছি, সেটা ঘটেছিল বহু বছর আগে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে । আমরা তখন বিশ্বযুদ্ধের কারণে টোকিও ছেড়ে নিইগাতা প্রিফেকচারে আমার বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য থাকতে গিয়েছিলাম ।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দ্রুত পরাজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে জাপান । চারপাশের অবস্থা ভয়াবহ ।

বয়স অল্প হলেও, আমিও জানতাম, যে কোনো সময়ই মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে পারে আমাদের জীবনে । চারপাশে সকলেই একধরনের ত্রাসের মধ্যে দিন কাটাত ।

নিইগাতায় যে ছোট্ট শহরে আমরা থাকতে গিয়েছিলাম, সেটা ছিল একটা বৈশিষ্ট্যহীন মফস্বল শহর । শাস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, নীচু নীচু ছাদের ঘরবাড়ী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারদিকে । মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত, আর দূরে নীলচে রঙের নীচু নীচু পাহাড়ের রেখা । ছোট্ট নদীতে স্বচ্ছ জলের মধ্য দিয়ে নানা রঙ-বেরঙের মাছের বাঁক চোখে পড়ত ।

টোকিও শহরে জন্মাবধি বড় হওয়া একজন বালকের কাছে এই সব কিছুই ছিল নতুন টাটকা আর বৈচিত্র্যপূর্ণ । কিন্তু তখনকার দিনে মফস্বল শহরে ছিল নানা সংস্কার ও প্রতিবন্ধকতা । সেগুলোকে উপেক্ষা করে প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্য্যে ডুবে থাকা আমার মত একজন বালকের পক্ষেও সবসময় সম্ভব হত না । সাদা কলারওয়ালার সার্ট গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরোলে প্রায়শই টিট্কিরি শুনতাম, কারণ গ্রাম্য ছেলে-ছেলেকরাদের মধ্যে এই ধরনের ফ্যাশন তখনো চালু হয় নি । হাটতে বেরোলে অনেকেই ধরে ধরে জিজ্ঞেস করত আমার দেশ কোথায় । এইসব চাহনি আর প্রশ্ন উপেক্ষা করার জন্য অনেক সময়ই আমি লোকালয়ের বাইরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগে বেশী মনোনিবেশ করতাম ।

চতুর্থ শ্রেণীতে ওঠার পর, আমরা লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে স্কুলে যেতে শুরু করলাম, কারণ তখন প্রচুর ধানী জমি চষবার অভাবে শূন্য পড়ে ছিল । ধানের বীজ বপন করা কঠিন কাজ ছিল, কিন্তু ফলনের পর আঁটি বাঁধা ছিল আমার কাছে অনেক বেশী কষ্টকর ব্যাপার । কিছুতেই ঠিকভাবে করে উঠতে পারতাম না । অন্যান্য ছেলেরা ঠাট্টা করত । একটা ছেলে অবশ্য মাঝে মাঝেই আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত । ওর মুখটা আজও আমার মনে আছে ।

দেশে ক্রমশঃ খাদ্যাভাব দেখা দিচ্ছিল । যদিও নিইগাতা জেলায় প্রচুর ধানের চাষ হত, কিন্তু আমাদের মতো শহরে মানুষরা ফসল ফলানোর কাজে বিশেষ পটু ছিলাম না । বুঝতে পারতাম যে, দৈনন্দিন খাদ্য জোগানো আমার মায়ের পক্ষে ক্রমশঃ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে । শুধু আলু, রাঙাআলু ও কুমড়া দিয়ে আর পেট ভরত না । সবচেয়ে খারাপ হল যখন চিনির সরবরাহ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল । কালেভদ্রে র্যাশনে চিনি পাওয়া গেলে, কোনো

কোনো দিন মা মিষ্টি বীনের পুর দিয়ে মোচি পিঠে বানাতেন । সেই সব সকালগুলোতে বাড়ীটা উৎসব মুখর হয়ে উঠত । ভাইদের মধ্যে পিঠের ভাগাভাগি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক লেগে যেত । সব সময়ই আমরা ক্ষুধার্ত বোধ করতাম ।

দেখতে দেখতে জানুয়ারী মাসের প্রবল ঠাণ্ডা শুরু হয়ে গেল । বরফপাতের দিনগুলোর জন্য বাড়ীতে কিছু খাদ্যের সঞ্চয় রাখা দরকার । কী করে কী হবে ভেবে সকলে আকুল হয়ে উঠলাম ।

এইরকমই একটা সময়ে আমাদের ক্লাশের মেয়ে কেই-এর সাথে আমার বন্ধুত্ব হল । ধ্বংসের ফর্সা গায়ের রঙে কিছুটা গোলাপী আভা, বড় বড় দুটো কালো চোখ, আর ঘাড় পর্যন্ত ঘন কালো চুল । আশ্চর্যের ব্যাপার, আজও কোনো সুন্দরী মেয়ের প্রসঙ্গে আমার প্রথমেই কেই-এর কথা মনে পড়ে যায় । যদিও চতুর্থ শ্রেণীর বালক হিসাবে তখন কেই-এর সৌন্দর্য্য নিয়ে তেমন সচেতন ছিলাম না ।

প্রথম দিকে আমাদের ক্লাশে কেই-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমি বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলাম না ।

একদিন আমাদের ক্লাশে খুব জোর একটা বিতর্ক চলছিল । মনে পড়লে এখন হাসিই পায় । বিষয়টা ছিল জাপানের সম্রাট প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেন কিনা, অর্থাৎ উনি toilet যান কিনা । এরকম বোকা বোকা একটা বিষয় যে বিতর্কের বিষয়বস্তু হতে পারে, আজকের ছেলেমেয়েরা তা ভাবতেই পারবে না । কিন্তু তখন এটা একটা প্রশ্ন ছিল । আমাদের শেখান হত “সম্রাট ভগবানের সমান ।” অবশ্য এটাও জানতাম যে সম্রাট একজন বিশেষ প্রজাতির মানুষ । আর তাই, যেহেতু আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করতাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সম্রাট অবশ্যই টয়লেটে যান । কিন্তু এইধরনের ভাবনা-চিন্তাকে তখন দেশদ্রোহীতা বলে চিহ্নিত করা হত ।

আমার সহপাঠীরা তাই আমার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সরব হয়ে উঠল । এমনিতেই ক্লাশের পাঠ্য সামান্য সুযোগ পেলেই আমার উপর বাঁপিয়ে পড়ত, আর এখন যদি দেশদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত হই, তাহলে অবস্থা কী হতে পারে, ভেবে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল । বিতর্কটা হয়তো আরো কিছুদূর এগোত । এমনি সময়ে মেয়েদের মধ্যে থেকে কেই উঠে দাঁড়াল । “যদি সম্রাট একজন বিশেষ মানুষও হন, তাহলেও তিনি নিশ্চয়ই টয়লেটে যান । রাজপ্রাসাদে অবশ্যই টয়লেট আছে ।” কেই-এর কন্ঠস্বরে গ্রাম্য সুর থাকলেও, একধরনের দৃঢ়তা ছিল । আমি মুগ্ধ চোখে তাকালাম, এবং রাজপ্রাসাদে টয়লেট আছে, এই ব্যাপারটা ক্লাশের মধ্যে বেশ সমর্থন পেল । বাকী মেয়েরাও এবার উঠে দাঁড়িয়ে কেই-কে সমর্থন করে ছেলেদের বক্তব্য প্রতিহত করতে লাগল । হঠাৎ যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাওয়ায় ওখানেই বিতর্কের ইতি ঘটল ।

আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এবং মনোযোগ সহকারে মেয়েটির সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করতে লাগলাম । হয়তো ক্লাশের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত কেই ।

আমার মনে পড়ল আমার মামার বাড়ীর কাছেই মেয়েটির বাড়ী। যাতায়াতের পথে প্রায়ই দেখতে পেতাম মেয়েটিকে।

“আমার সঙ্গে খেলবে ?” একদিন বাগানের বেড়া টপকে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করল কেই। আমার হাৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল ! তখনকার দিনে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে খেললেও, চতুর্থ শ্রেণীর দুটো ছেলে মেয়ে একসঙ্গে খেলছে বা কথা বলছে, এটা একটু দৃষ্টিকটু ছিল। কিন্তু কেই এসব সংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাত না।

দু এক দিন বলার পর একদিন আমি কেইদের বাড়ীতে গেলাম। খেলা মানে দড়ি বেয়ে ওঠা, গাছে চড়া, বীনের খলি নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি -- এইসব।

“আমি তোমাকে আমার কমিকসগুলো পড়তে দেব।” -- কেই বলল একদিন।

বই-এর আদান-প্রদানও আমাদের খেলার একটা অঙ্গ ছিল। রক্ষ এবং কর্কশ প্রকৃতির ছেলেপিলেদের খুব একটা পছন্দ করত না কেই। আর আমি ছিলাম একটু স্পর্শকাতর এবং আবেগপ্রবণ প্রকৃতির। তাই হয়তো আমার সাথে খেলতে পছন্দ করত কেই। পরে জেনেছিলাম কেই-এর মা-ও ছিলেন টোকিওর মেয়ে। সেটাও হয়তো আরেকটা কারণ ছিল।

ক্লাশের অন্যান্য ছেলেরা আমাদের একসঙ্গে দেখলে কী হতে পারে? খেলার সময় এইসব ভাবনা সবসময়ই আমার মাথায় ঘুরপাক খেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অদ্ভুত ভাল লাগায় মন ভরে থাকত আমার। যে সময়টুকু আমরা একসঙ্গে কাটাতাম, সেটুকুই ছিল খুব মূল্যবান।

কেই আমার এইসব ভাবনাচিন্তা এবং ভাল লাগা সম্পর্কে অবহিত ছিল বলে মনে হত না। খেলার সময়টুকু ও খেলার মধ্যেই ডুবে থাকত।

“এইদিকে এসো।” -- একদিন কেই বেশ গভীর স্বরে আমাকে ডাকল। বাগানের মধ্য দিয়ে আমি ওর পিছন পিছন চললাম। “হিগুরাশির” একঘেয়ে ডাক মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল শরতের আগমনের কথা। আমরা দ্রুত গতিতে বাগানের শেষ প্রান্তের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

কেই একটু গ্রাম্য ধরণের একরকম স্কার্ট পরতো। তার সঙ্গে ঢিলে ঢালা ব্লাউজ। কিন্তু যাই পরুক না কেন, ওকে অন্য মেয়েদের থেকে একটু আলাদা লাগত। একধরণের আভিজাত্য ছিল কেই-এর মধ্যে।

কেইদের বাড়ীটা বেশ বড় ছিল। প্রায় হাফ একর জমি দিয়ে ঘেরা। বাগানের গাছগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাড়ীটাকে ঘিরে রেখেছিল। বাকী জমিতে মিষ্টি আলু আর ভুট্টার চাষ হত। খাদ্যাভাব যখন বেশ বেড়েছিল, তখন সবজি চোরেরা প্রায়ই ওদের উঁচু কাঁটাতারের বেড়া টপকে সবজি চুরি করতে আসত।

আমরা বাগানের একদম শেষ প্রান্তে চলে এলাম। গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা ফুলে ভরা একধরণের গাছ টিনের বেড়ার উপর ঝুঁকে পড়েছে। সাদা ফুলগুলো ছোট ছোট সাকের পেয়ালার মত দেখতে, ভেতরে স্বচ্ছ একটুখানি মধু টলটল করছে।

-- “খুব মিষ্টি স্বাদ।”

কেই একটা ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে মধুটা গলায় ঢেলে দিল। আমিও তাই করলাম ওর দেখাদেখি। টাটকা মিষ্টি মধুতে মুখ ভরে গেল।

“কী, বলছিলাম না?” চক্চকে চোখে কেই তাকাল আমার দিকে। দুটো, তিনটে --- একটার পর একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে

মুখে ঢেলে দিতে লাগলাম আমরা। এ্যাজেলিয়া ফুলের মধু হাল্কা ধরণের মিষ্টি, কিন্তু এই ফুলের মধুর স্বাদ অনেক বেশী তীব্র, আর ঘন।

-- “একটু দাঁড়াও।” কেই বেড়ার পাশ দিয়ে দৌড়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে দুখানা ছোট গ্রাশ নিয়ে এসে হাজির হল। গ্রাশের মধ্যে মধুগুলো নিংড়ে নিয়ে পান করা হবে।

ফুলের ভারে ডালগুলো নুয়ে পড়েছে। গাছগুলোর উচ্চতা আমাদের নাগালের সামান্য উপরে। কেই লাফিয়ে উঠে ডাল বাঁকিয়ে নিয়ে একটা একটা করে ফুলের মধু গ্রাশের মধ্যে জমাতে লাগল। আধ গ্রাশ ভর্তি হতেই বহুক্ষণ লেগে গেল। প্রায় সবকটা ফুল থেকে মধু নিংড়ে নেবার পর গ্রাশ দুটো ধরে আমরা পরস্পরের দিকে হাসিমুখে তাকালাম বেশ কিছুক্ষণ ধরে দুই হাতের মধ্যে ঘষে মধুগুলোকে কিছুটা গরম করার চেষ্টা করলাম। তারপর পান করতে শুরু করলাম। খুব মিষ্টি।

-- “আমি এই ফুলগুলো আবিষ্কার করেছি।”

-- “সত্যি?”

-- “কী দারুণ মিষ্টি না?”

-- “তুমি কি রোজই সকালবেলায় এই মধু খাও?”

-- “রোজ হয় না। আবার মধু পাওয়া যাবে বুধবার নাগাদ। সবচেয়ে ভাল হয় ভোরবেলা, স্কুলে যাবার আগে। চলো একসাথে খাওয়া যাবে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।”

অবশ্যই আমার কোনো আপত্তি ছিল না। তবে মধুর থেকে আমাদের দুজনের এই গোপন আবিষ্কারের ব্যাপারটাই আমাকে বেশী আনন্দ দিচ্ছিল।

এখন ভাবি ওটা ঠিক কী ফুল ছিল? আমার মনে হয় “ফুইও” গোলাপ জাতীয় কোনো ফুল। কিন্তু “ফুইও” তে এত মধু থাকে না। আমরা ওটাকে নাম দিয়েছিলাম “মধুফুল”।

“কাউকে বোলো না।”

-- “অবশ্যই নয়।” আমার উপর অনাস্থায় আমি একটু আহত হয়েছিলাম।

ফুলের গাছের নীচে আমাদের এই গোপন মিলন সপ্তাহে দু দিন হত। মনে আছে, কেই মেয়েদের সাথে খুব একটা খেলত না। আমার প্রতি কী কোনো বিশেষ ভাল লাগা তৈরী হয়েছিল কেই-এর মনে? জানি না।

মিষ্টি আলুর ক্ষেতের কোনায় একটা ছোট ডোবা ছিল। কাদা ভর্তি জলে ছোট ছোট কাংলা আর তেলাপিয়া জাতীয় মাছ থাকত। বেশীর ভাগ সময় মাছগুলো গভীর জলে থাকত, কিন্তু কখনো কখনো দু একটা মাছের দেহাবশেষ পারের কাছে ভেসে উঠত। আর কেই মরা মাছের দেহগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পারে তুলে, স্ট্রবেরী গাছের নীচে পুঁতে দিত। জায়গাটা ছিল অনেকটা মাছদের সমাধিস্থলের মত।

-- “জান কেন আমি মাছগুলোকে এখানে গোর দেই?” কেই একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু উত্তরটা বলেনি। হয়তো কোনো গোপন কারণ ছিল।

দেখতে দেখতে শীত এসে গেল, আর ডোবার জলগুলো জমে বরফ হয়ে গেল। দীর্ঘ শীতকাল আমাদের মিলনকে অনেকদিনের জন্য বন্ধ রাখল।

নতুন বছরে, বরফ গলে যাবার পর, অনেক দিন বাদে আমি আর কেই ডোবার ধারে গেলাম। একটা বিশাল বড় মাছের দেহাবশেষ জলের উপর ভাসছিল।

--“এটা কাংলা ” বলল কেই।

ডোবার জলটা খুব ঠাণ্ডা। কতদিন আগে মাছটা মারা গেছে, কে জানে! দেহটা পচতে শুরু করেছে, আর চর্বিগুলো বেরিয়ে পড়েছে। এটাকেও স্ট্রবেরী বোপের নীচে সমাধি দেওয়া হল।

-- “জান, কেন আমি এইখানে মাছগুলোকে গোর দেই? ”
আমি মাথা নাড়লাম।

--“এটা আমার বাগান। ” ছোট ছোট স্ট্রবেরী বোপগুলো কেইদের পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের নামে নামে বিভক্ত, এবং প্রতি ভাগের ফলিত স্ট্রবেরীর মালিক সেই ভাগের অংশীদার।

-- “মাছ পচে সার হয়, আর আমার স্ট্রবেরীগুলোও আরো বড় বড় আর মিষ্টি হয়ে ওঠে। ”

এবারে বুঝলাম। মৃত মাছের পচা গলা দেহ থেকে খুব ভাল জৈব সার হয়। কেইও বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ছিল। আসলে, মেয়েদের তুলনায় কেই অঙ্কে আর বিজ্ঞানে খুব ভাল ছিল। ক্লাশে মাঝে মাঝেই কেই আর আমি ডাক পেতাম অঙ্কের প্রশ্ন সমাধানের প্রতিযোগিতায়। কেই তখন খুব শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হয়ে উঠত। প্রতিযোগিতায় হারা ওর একেবারেই পছন্দ ছিল না। আমি জিতলে ও বেশ আহত হত।

বসন্তের সমাগমে, কেই-এর অংশের স্ট্রবেরীগুলো বেশ বড় বড় আর রসাল হয়ে উঠল। দুটো রসাল স্ট্রবেরী ছিঁড়ে নিয়ে একটা আমার হাতে দিল কেই।

-- “কেমন? ভাল নয়?”

রসাল মিষ্টি ফলের গায়ে কামড় দিতে দিতে আমার মৃত মাছের দেহাবশেষের কথা মনে পড়ল। এই স্ট্রবেরীটা গাছের মূলের সাহায্যে মাছটার পচা গলা জৈব রস শোষণ করে পুষ্টি সংগ্রহ করেছে। ফলটার মধ্যে একটু সোঁদা মাটির গন্ধ। কেই-এর ঠোঁট দিয়ে স্ট্রবেরীর লাল রস গড়িয়ে পড়ছিল।

বসন্ত শেষ হল, আর যতই গ্রীষ্মের দিনগুলো এগিয়ে আসতে লাগল, যুদ্ধের পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে লাগল। এমনকি এই ছোট্ট মফস্বল শহরেও মাঝে মাঝেই এয়ার রেইড এ্যাটাকের সাইরেন শোনা যেত। আকাশে শত্রু সেনার বিমান চোখে পড়তে লাগল। আমি প্রাণপণে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন “কামিকাজে ” বহিতে শুরু করে সব বিপদের অবসান ঘটাবে।

পয়লা আগষ্ট, মায়ের ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। শহরের মধ্যস্থল থেকে গনগনে আগুনের শিখা চোখে পড়ছিল। আকাশটা খুব লালচে দেখাচ্ছিল। আমরা সবাই এয়ার রেইড শেলটারে জড়ো হলাম। হঠাৎ কেউ একজন চিৎকার করে উঠল – “পালাও, পালাও, এখান থেকে পালাও। ” আমরা সবাই দৌড়াতে শুরু করলাম।

আমাদের বাড়ীটা শহরের বাইরের দিকে ছিল। প্রায় দুশ ইয়ার্ড দৌড়ে আমরা সবাই একটা ধানক্ষেতে এসে পৌঁছলাম। আকাশে প্রচুর B-29 বিমান ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ আকাশে একটা আগুনের গোলা দেখা গেল-ব্যাং ব্যাং ব্যাং!

বিষ্ফোরণের বিকট আওয়াজে সব কিছু কেঁপে উঠল।

B-29 থেকে ফেলা কিছু বোমা মাটিতে পড়ার আগেই বিষ্ফোরিত হয়েছিল, আর কিছু মাটিতে স্পর্শ করার পর। চোখে পড়ল দূরে বহু বাড়ীঘর দাঁড় দাঁড় করে জ্বলছে। মনে হল আমরা সবাই যেন একটা অগ্নি বলয়ের মাঝখানে রয়েছি। আকাশে ঘুরপাক খাওয়া শত্রুপক্ষের বিমানগুলো থেকে আগুনের শিখার আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল, কেমন ভয়ঙ্কর কমলা রঙের লাগছিল সব কিছু।

নিইগাতার এই শহরটায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তেমন কিছু ছিল না। আমরা অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধ্বংসের রূপ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম শুধু। “ঐ দিকে দেখ। এইবার এইদিকটা জ্বলছে। ”

ঘন্টা দুয়েক বাদে এয়ার রেইড বন্ধ হল। আমি আমার মামীর সঙ্গে বাড়ী ফিরলাম। শহরের কিছুটা বাইরে হওয়ায় আমাদের বাড়ীটা বেঁচে গিয়েছিল। বাড়ীর কিছু দূরে একটা ধানক্ষেত তখনো দাঁড় দাঁড় করে জ্বলছিল।

একে একে পাড়ার লোকজন জড়ো হতে লাগল –

--- “অমুক শহরটা পুরো জ্বলে গেছে। ”

--- “তমুক পাড়াতে একটা বাড়ীও আঁস্ত নেই। ”

মাত্র কিছু এলাকা বোমার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। ভোরের আলো সামান্য ফেটার পর দোতলার জানালা থেকে দেখা সেই দৃশ্য আমি জীবনে কোনোদিনও ভুলব না। যদিকে দু চোখ যায় দু একটা অটালিকার পোড়া কালো কাঠামো ছাড়া সমতলে মিশে গেছে।

ভাগ্যক্রমে আমাদের পরিবারের কারো কিছু হয় নি। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মর্মান্তিক সব মৃত্যু সংবাদ কানে আসতে লাগল। আমাদের স্কুলের জিম্ শবদেহ রাখার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

এয়ার রেইডের কয়েকদিন বাদে আমার কেই-এর কথা মনে হল। কেইদের এলাকায় তো প্রায় সব কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন গ্রীষ্মের ছুটি চলায় আমি কেই এবং অন্যান্য বন্ধুদের সম্পর্কে কিছু জানতে পারলাম না।

সেই গ্রীষ্মে অসম্ভব গরমও পড়েছিল। বেলা বাড়লেই প্রচণ্ড তাপে চারদিকে পোড়ো ঘর-বাড়ী, ধ্বংসস্তূপ যেন আরো তেতে উঠত। জলের অভাবে অনেক ধ্বংসস্তূপ থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছিল।

শবদেহগুলো গোর দেওয়ার সুব্যবস্থা না থাকায় মানুষজন এখানে ওখানে গর্ত খুঁড়ে প্রিয়জনদের দেহাবশেষ কবর দিতে বাধ্য হচ্ছিল।

অবেশেষে সম্রাট পরাজয় ঘোষণা করলেন। তারপরেই আমি কেই-এর মৃত্যুসংবাদ শুনলাম। অবাক হইনি।

বহু মানুষের মৃত্যুর গুজব শোনা যেত, আবার মাঝে মাঝে মৃত বলে চিহ্নিত কোনো মানুষ সহসা আবির্ভূত হয়ে সকলকে চমকে দিত। কেই-এর পরিচিত মূর্তিটাও কী একদিন এভাবে দেখা দেবে না? মনের কোনায় একটা আশা লুকিয়ে ছিল।

আমরা সকলেই তখন মৃত মানুষদের থেকে জীবিত মানুষজন ও তাদের জীবনধারণের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এখানে ওখানে গৃহহীনদের জন্য ব্যারাক তৈরি হচ্ছিল। সেপ্টেম্বর মাসে নতুন সেমিষ্টার শুরু হল ক্লাশে। কিন্তু কেই দেখা দিল না। তখন ধান ফলনের সময়, তাই আমরা ছাত্ররা মাঠেই কাজ করতাম।

খাদ্য সরবরাহের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নি। ক্ষিধের মুখে যা পেতাম
থেয়ে ফেলতাম।

একদিন সকালে ঘুম ভেঙে আমার “মধুফুল ” এর কথা
মনে পড়ল। কী করে এতদিন ভুলে ছিলাম ওদের কথা? এখন
শরতকাল, গাছগুলো নিশ্চয়ই সাদা ফুলে আবার ভরে উঠেছে।
ধড়মড় করে উঠে কেইদের বাড়ীর দিকে দৌড়লাম।

ওদের বাড়ীর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই, শুধু কিছু পোড়া
প্রাণহীন গাছের মাঝখানে একটা হেলে পড়া কুঁড়ে ঘর দাঁড়িয়ে
আছে। মনে হল কেই-এর পরিবারই হয়ত ওখানে কোনোরকমে
মাথা গুঁজে বসবাস করছে। কেই হয়ত ওখান থেকে একুনি মাথাটা
বার করে দৌড়ে আসবে। যদিও জানতাম কোনোদিনই ওকে আর
দেখতে পাব না আমি।

আমি ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে কোনোরকমে পিছন দিকের
বাগানে চলে এলাম। মধুফুলের গাছটা বেঁচে আছে!! প্রতিটা ডাল
থোকা থোকা সাদা ফুলে ভরে উঠেছে। ঠিক যেন “তানজাকু ”
কবিতার সাদা পাতা দিয়ে গাছটাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। জ্বরের
মত উত্তপ্ত দেহ নিয়ে আমি দৌড়াতে শুরু করলাম ঐ দিকে।

গতবছরের থেকে অনেক বড় বড় হয়েছে এবার ফুলগুলো।
প্রতিটা ডাল ফুলের ভায়ে নুয়ে পড়েছে। মধু টলটল করছে ভেতরে।
একটা ফুলের পাঁপড়ি ছিঁড়ে মধুটা গলায় ঢেলে দিলাম। মিষ্টি স্বাদে
আমার জিহ্বা, গলা ভরে উঠল। একটার পর একটা, ফুলের পর
ফুল ছিঁড়ে পাগলের মত মধুগুলো শুষে নিচ্ছিলাম।

হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। হয়ত
মধুফুলের স্বাদটাই আমাকে অবশেষে কেই-এর
মৃত্যুকে মেনে নিতে বাধ্য করল। একটার
পর একটা ফুল ছিঁড়ে ঠোঁটে ঘষে কেই-কে
আমার চেতনার মধ্যে বাঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা
করছিলাম। জনমানবহীন পোড়ো বাগানে
একটা কন্ঠস্বর শোনা গেল ---

--- “এই বছর ফুলগুলো খুব
ভাল হয়েছে, তাই না?”

--- “অনেক বড় হয়েছে।”

--- “ভর্তি মধু।”

সেই শরতে কী বার
বার ঐ ফুলগুলোর কাছে
যেতাম? ধূসর রঙের
পোড়ো ধ্বংসস্তুপের
মাঝখানে মধুফুলের গাছটা
ফুলে ফুলে ঢেকে আছে। যেন
বিজয়ীর মত ঘোষণা করছে প্রাণের স্পন্দন।



সাদা ফুলগুলোর মধ্য থেকে কেই কী বেরিয়ে আসবে না?

--- “দেখো! ভাল নয়?”

--- “আমি ওদের আবিষ্কার করেছি।”

--- “তুমি কিন্তু কাউকে বোল না।”

ফুলের মধুর মিষ্টি, হালকা স্বাদ চিরকালের মত কেই-এর
স্মৃতির সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে আছে।

বহুদিন আগের কথা। আমি জানিনা মধুফুলের গাছটার কী
হয়েছিল তারপর। ফুলের নামটাও জানা নেই আমার। মাঝে মাঝে
মনে হয় ঐ ফুলগুলোর কাছে ফিরে গেলে হয়ত সেই পুরোনো
দিনগুলোকে আবার ফিরে পাব।

১৯৪৬ সালে টোকিওতে ফেরত চলে এসেছিলাম আমরা।
পরে শুনেছিলাম কেই-এর মৃত্যু নখিভুক্ত হয়েছিল। এয়ার রেইড
এ্যাটাকে জীবন্ত পুড়ে গিয়ে কেই-এর মৃত্যু হয়। ওর পরিবার
দেহটাকে ওদের বাগানেরই প্রান্তে একটা কোনায় কবর দিয়েছিল।
মধুফুলের গাছটার তলায় কী?

সেই শরতে অসম্ভব ভালো ফুল হয়েছিল, ফুলগুলো মিষ্টি
মধুতে ভর্তি ছিল। গাছখানা যেন পাগলের মত বারে বারে প্রাণের
প্রাচুর্য্যে ভরে উঠছিল, শ'য়ে শ'য়ে সাদা ধবধবে ফুল হাওয়ায়
দোল খেত -- অদ্ভুত সাদা রঙ, স্বপ্নের মত। কেই কী ঐ গাছটার
তলাতেই ঘুমিয়ে ছিল?

মৃত মাছটা হয়ে গিয়েছিল মিষ্টি রসাল
স্ট্রবেরী, আর কেই পরিণত হয়েছিল
ফুলের মিষ্টি মধুতে। গাছটা শিকড়-
বাকড়, মূলের সাহায্যে টেনে নিয়েছিল
কেই-এর দেহের কোষগুলোকে। আর
আমি সেই গাছের মিষ্টি ফুলের মধু
পান করেছিলাম। পান করেছিলাম
কেই-কে। কেই তাহলে নিশ্চয়ই
আমার মধ্যে বেঁচে আছে?

অনেক দিন আগের
কথা। কতটা সত্যি,
কতটা কল্পনা মিশে আছে,
বুঝতে পারি না। হয়ত
আমার দেহকোষগুলোর
নানাবিধ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে
রূপান্তরিত কেই আমার দেহের
মধ্যেই বেঁচে আছে আজও। ☺

বালিশ সুপর্ণা বসু



বালিশ ফেরত নিয়ে যাচ্ছি দেখে করবীদি মুচকি হেসে বললেন বেরোনোর আগে , ‘দেখিস , ট্রেনে বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়িসনা যেন !’ হেসে বলেছিলাম , ‘ধ্যাৎ ! কি যে বল !’

কিতা-শিনাগাওয়া হাসপাতালে ভর্তি করবীদি । যে দিনই দেখতে যাই , সেদিনই আমার জাপানী ভাষার দৌড় শুনে রিসেপশনের মেয়েগুলো হাসে । খিলখিল করে নয় , ভদ্রভাবে , মুচকি হেসে । ‘সায়োনারা ’ বলে -- আজও বলল । তাতে আর আলাদা করে পাত্তা দিইনা । আমার মুখে ভাঙা জাপানী ভাষা শুনে সব জাপানীই হাসে -- এতে আবার নতুন কি ?

হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই ফুটব্রীজ -- পার হলে কিতা-শিনাগাওয়া স্টেশন । কেইকিউ সেন ধরে যাব শিনাগাওয়া --- সেখান থেকে য়ামানোতে সেন ধরে শিবুইয়া --- সেখান থেকে ৩ নম্বর বাসে করে নিসেসকি হাসপাতালে নেমে বাড়ী যাব । ফুটব্রীজে উঠতে উঠতেই প্রথম বিজাট ! শিনাগাওয়া মেয়েদের ইকুলের (জোশি গাকুইন) ১৩ / ১৪ বছরের মেয়েগুলো একে অপরের গায়ে গড়িয়ে পড়ল । আহা , ন্যাকা , যেন বালিশ কখনো দেখিস নি ! মনে হচ্ছে , এবার বয়স হচ্ছে । আজকাল মাঝে মাঝেই মনে হয় ,

অল্পবয়সী ছেলেপুলেরা কথায় কথায় বড় বেশী হাসে ।

কেইকিউ লোকাল ফাঁকাই থাকে । আমার হাতে বালিশ ছাড়াও ছিল পম্পাদুর বেকারির পাউরুটির প্যাকেট আর ন্যাশনাল থেকে কেনা শাকসজি । কাজেই অসুবিধে হল না । ভিড় বাড়ল শিনাগাওয়া স্টেশনে । বাড়ল বিপত্তিও । দিনের যে সময়ই হোক না কেন JR য়ামানোতে সেনে সব সময়ই ভিড় । অফিসযাত্রী ভদ্রলোক , ভদ্রমহিলা , ছাত্রছাত্রী , বৃদ্ধ-বৃদ্ধা , রোজই থাকে , সব সময়ই থাকে । তবে আজ, তাদের ব্যবহার দেখে একটু অবাকই হলাম । জাপানীরা বড়ই ভদ্র । আজ আমার দিকে এরা এত তাকায় কেন ? আজ তো শাড়ীও পরিনি । বঙ্গললনার শাড়ীগয়নার জাঁকজমক দেখে চমকিত ও অভিভূত সব জাপানীই । কিন্তু আজ তো আমার পরণে সাধারণ জিনস্ ও টি-শার্ট । তবে কি ওরা তাকাল আমার বগলদাবা করা বালিশের দিকে ?

ভাল করে তাকাই ফিরে বালিশের দিকে । আকাশী নীল কাটওয়ার্কের প্রায় নতুন ওয়ার পরিহিত মাঝারি সাইজের বালিশ । ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখি ---- না , কোথাও ছেঁড়েও নি । ঠিকই আছে ।

বালিশ থেকে চোখ তুলে দেখি সামনে দাঁড়ান ভদ্রলোককে ।

সাধারণ কালো কোট-প্যান্ট-টাই পরা এদেশীয় ‘স্যলারি-ম্যান’ -- কিন্তু উনি ভদ্রতা ভুলে চোখ গোল করে তাকিয়ে আছেন নীল আকাশের রঙে রাঙা বালিশের দিকে। তার পাশে দাঁড়ান ছাই রঙের স্ফার্ট, ধপধপে সাদা বলাউজ, গলায় মুক্তের হার, কানে ম্যাচিং দুলা পরিহিতা ৭০ ছুঁছুঁই মাসীমা --- তিনিও তাকিয়ে! তাঁর পাশে দাঁড়ান কিশোরী --- তার বাঁ চোখের চারিপাশে কালো রঙ দিয়ে আঁকা বেড়াল -- মুখে, কানে, জিভে, গালে অসংখ্য দুলা পরা। কালো প্যান্ট, কালো ফ্রক, তার ওপরে সাদা লম্বা গেঞ্জি, তার ওপরে হাতকাটা ছোট বেগুনি গেঞ্জি, মাথার সাদা টুপির মধ্যে থেকে উঁকি মারছে বেগুনি চুল (নির্ঘাৎ হারাজুকুতে নামবে!) --- সেও হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

আমিও তোয়াক্কা করি না -- না হয় বালিশ নিয়েছি হাতে, না না বগলে! তা বলে কি এসে যায়? তবে কি কোনোদিন কেউ জাপানে ব্যাগ ছাড়া হাতে বালিশ নিয়ে বাসে ট্রেনে চাপেনি কখনো? নিতান্তই বাড়াবাড়ি। এদের যেন সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি!

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে শিবুইয়া এসে গেছে -- যাই, উঠি। বড্ড ভিড়, ‘সুমিমাসেন, সুমিমাসেন’ করতে করতে এগোই দরজার দিকে। পাশে চল্লিশোর্ধ সুন্দরী -- হিলারি ক্লিন্টন মার্কা প্যান্ট-সুট পরিহিতা -- আমাকে (না, না, বালিশকে!) ধাক্কা

মেরে এগিয়ে গেলেন। তাকালেন পেছনে, মিষ্টি হেসে বললেন, ‘গোমেন্ নাসাই নে’, আমাকে নয়, পরিষ্কার বালিশের দিকে তাকিয়ে।

শিবুইয়া স্টেশন থেকে ৩ নম্বর বাস স্ট্যাণ্ডে নিসেসকি হাসপাতালের বাসে ওঠা এবং টোকিও জোগাক্কানের স্টপেজে নামা অবধি কি হল, তা শুনবে, করবীদি? সে তোমাকে না বলাই ভাল। তখন আমিও বেপরোয়া -- শুধু গুনছি -- বাঁ পাশের ভদ্রলোক পাঁচবার তাকালেন, ডানদিকের দাদু দুবার, কোনের ওই দিদিমা নেহাৎই ভদ্র, একবার তাকিয়ে আর নয়; আর ওই ইঙ্কুলে যাওয়া বছর দশেকের বাচ্চাটি --- আহা! ওভাবে তাকিও না সোনা। রাস্তা পার হতে হতে হড়কে পড়ে যাবে যে! এইবার বুঝেছি -- কোনো যুগেই নয়, নারা, হেইয়ান, কামাকুরা, মুরোমাচি, এদো, মেইজি, শোওয়া -- গত কয়েক হাজার বছরে -- গ্রামে বা শহরে -- জাপানে কেউ, কোনো দিন, কোনো জন্মে বালিশ বগলে রাস্তায় বেরোয় নি।

কয়েক দিন পরে হাসপাতালে যেতে করবীদি বললেন, ‘কি রে, ঘুমিয়ে পড়িস নি তো ট্রেনে, বালিশে ঠেস দিয়ে?’ জিভ কেটে বলি, ‘ধ্যাৎ, কি যে বল! কত কিছু হয় রোজ লোকাল ট্রেনে, তাকিয়ে থাকার মত। ঘুমোনো যায় কখনো?’

জাপানে ক্ষুদ্দার দুর্গা দর্শন

অনুপম গুপ্ত

ক্ষুদ্দা মানে আমাদের ক্ষুদিরাম চাকলাদার তাঁর স্ত্রী মানে রমলা বৌদিকে নিয়ে জাপানে গিয়েছিলেন তাঁদের পারিবারিক প্রয়োজনে। ভ্রমণের কিছু কিছু বিবরণ ক্ষুদ্দা আমাদের আগেই জানিয়েছিলেন। ক্ষুদ্দার করুণ কাহিনী (করুণ কিনা বলা না গেলেও হাস্যরস মিশ্রনের ভাগ হয়তো অনেকটাই ছিল।) শুনে আমাদের মজাই লেগেছিল। কিছু মুশ্কিল হল যখন দাদার প্রবাসী প্রিয়জনেরা দুর্গা পূজা পর্যন্ত দাদা বৌদিকে থেকে যেতে বললেন। জাপানী ভাষার সীমিত জ্ঞান ভাঙার নিয়ে কি ওখানে বেশদিন থাকা যায়? সুমিমােসন, আরিগাতো গোজাইমাস, ওহ-হাই-ও গোজাইমাস, কোন্বানওয়া, কোমিচিওয়া, গোমেন-নাসাই -- এই কয়েকটা শব্দভাঙার নিয়ে কি আরও তিন মাস থাকা যায়? ওদের কথা না শুনে নিজেরা Narita Airport-এ যেতে গেলেও তো বাসে বা ট্যাক্সিতে গন্তব্যস্থলের কথা জাপানী ভাষায় বলতে হবে। তার থেকে বরং ছেলেদের কথা শুনে পূজা পর্যন্ত Visa Extend করাই ভাল।

বৌদি জানেন রথযাত্রার দিনে দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো তৈরি করা হয়। তাঁর বায়না জাপানের রথযাত্রা দেখবেন এবং নিজের মাথার চুল খানিকটা কেটে রাখের চাকায় দেবেন যাতে চুল আরও ঘন এবং আরও প্রলম্বিত হয় (অবশ্য আর কিছুদিন পরে চুল কাটার মতো আর কিছু থাকে কিনা সন্দেহ আছে -- মস্তক সবসময় হয়তো ঘোমটায় ঢাকা থাকবে।) জাপানে দুর্গা পূজা হলেও কুমোরপাড়া যে নেই, সেটা ক্ষুদ্দা জানলেও রমলা বৌদিকে বোঝানোই গেলনা।

বৌদির কড়া হুকুম, “তুমি এই ক’দিন একদম দরজা খুলবেনা। পাড়ার ছেলেরা যখন জাপানী ভাষায় চাঁদা চাইবে, তুমি কিছু বলতে পারবে? চাঁদা বাবদ কত Yen এরা চাইবে তুমি জান?” এর মধ্যে একদিন ভর দুপুরবেলায় কোনও এক আগন্তুককে ছবি বাড়ীর Inter com-এর যন্ত্রটায় ফুটে উঠল এবং কিছু বক্তব্য শোনা গেল। আতঙ্কিত বৌদি চিৎকার করে মা দুর্গাকে ডাকছেন আর দাদাকে দরজা খুলতে নিবেদন করছেন। আসলে ছেলোটো এসেছিল স্থানীয় দোকান COSTCO থেকে কেনা মাল delivery দিতে।

শুভ মহালয়ার দিন তর্পণ করার কথা -- কিছু জাপানে গঙ্গা কোথায়। দেখা গেল বাড়ীতে Pacific-এর জল আছে -- সেই জল দিয়েই তর্পণ করা হল। কিছু মুশ্কিল হল যাঁরা এতদিন তিল, তুলসী সহ যে নোংরা গঙ্গা জল তর্পণ মারফৎ পান করেছেন, তাঁরা ভাবলেন ক্ষুদিরাম এত পরিষ্কার জল পেল কোথা থেকে! রমলা বৌদির আদার, “হ্যাঁ গা, তুমি এক শিশি Pacific-এর জল আমার জন্য কোলকাতায় নিয়ে যাবে? ঐ পরিষ্কার জলেই আমার তর্পণ করো, গঙ্গার জল খেলে বমি হয়ে যাবে, জন্ডিসও হতে পারে।

কাশ ফুল ও বিশ্বকর্মা পূজা জানিয়ে দেয় দুর্গা পূজার আগমন

বার্তা। Kawasaki সরকারি আবাসনের ছাদে কিছু গাছ লাগান থাকে যেগুলো কাশফুলের মত দেখতে। কিন্তু বিশ্বকর্মা পূজা হয় কি? এই একটা দিনে মালিকের পয়সায় শ্রমিকরা বিশ্বকর্মা পূজা করবে, উচ্চগ্রামে মাইকে হিন্দী গান বাজান হবে, সন্ধ্যার পরে নিজের পায়ে দাঁড়ানর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। তবেই না শ্রমিকের স্বার্থ অটুট থাকবে, আমেরিকার মত অর্থনৈতিক মন্দা আসবে না। বৌদির নজর অবশ্য অন্য দিকে -- দেখছেন কেউ এখানে ঘুড়ি ওড়ায় কিনা। ক্ষুদ্দার মনে পড়ে আজ থেকে চল্লিশ / পঞ্চাশ বছর আগে ঘুড়ি ওড়ানোর নাম করে ছাদে উঠে আশেপাশের বাড়ীর ছাদে দাঁড়ান কিশোরীদের দিকে তাকিয়ে মুচুকি হাসি হাসা এবং প্রেম নিবেদন করা। বৌদি এটা জানেন। তখন দাদার ইচ্ছা হত তিনি যেন ঘুড়ি হয়ে মেয়েটির গালে গোত্রা খেয়ে পড়েন। বৌদির তাৎক্ষণিক জবাব, তাহলে তিনি লাটাই থেকে সুতোয় গোড়াটি কেটে দিতেন।

২০০৮ সালে টোকিওতে দুর্গা পূজা হয়েছিল ১১ই অক্টোবর, শনিবারে। মাত্র একদিনেই পূজা হয়। যদিও কলকাতায় পূজা ৬ই অক্টোবর থেকে শুরু, চলে চারদিন ধরে। ১১ই অক্টোবর শনিবার Omoriতে একটা Public Hall-এর সাত তলায় জাপানের প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চারশো জন উপস্থিত ছিলেন। সকাল থেকে শুরু, চলে প্রায় রাত ৮টা পর্যন্ত। অঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ বিতরণ, দুপুরের ভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিঁদুর খেলা এবং সবশেষে নদীতে বিসর্জনের পরিবর্তে পরের বছরের জন্য প্রতিমাকে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার জন্য বিদায় জানানো। অদ্ভুত এবং অবশ্যই সুন্দর এক অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ী ফেরা হল।

অনেক রাত। ক্ষুদ্দা দেখলেন কাওয়াসাকির বাড়ীতে মা দুর্গা এলেন। দাদা শশব্যস্ত হয়ে বললেন, “মা, তোমাকে কোথায় বসতে দেব?”

মা দুর্গা -- “ঠিক আছে, ঠিক আছে। সিংহটার পিঠে বসে থাকতে থাকতে কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে। আরে তোদের গুপী গায়ের গাধার পিঠে চড়ে যেতে যেতে তারও তো কোমরে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল, তাই না?”

ক্ষুদ্দা --- “আচ্ছা মা, তোমার পূজার দিনে একতলায় খোলা জায়গায় এখানকার এক দিদি ধূমপান করছিল বলে তুমি কি খুব রেগে গেছ?”

মা দুর্গা --- “ও মেয়েটি সিগারেট খায় বটে, কিন্তু মনটা খুব ভাল। এই দেখ না, আমার বুড়োটা সারাদিন নেশা করে, গাঁজা ফাঁজা খায়, কিন্তু মনটা ভাল। আরে সেই জন্যেই তো কুমারী মেয়েরা শিবের মতো বর চায়। ওদের বরদের শুধু মনটা হবে শিবের মতো। বাপের বাড়ী গেলে আপত্তি করবে না। চাকরী করতে বাধা দেবে না। Minimum কাপড় দিয়ে বানানো জামা পরলে বর রাগ করবে না। শনি, রবিবার বা অন্যান্য ছুটির দিনে

রান্নাঘর তালা বন্ধ করে বাইরে খাওয়ার উপকারিতার কথা বরকে বেশী বোঝাতে হবে না। মনটা শিবের মত হবে, কিন্তু দেখতে শিবের মতো হলে চলবে কি? খালি গা, বিশাল ভুঁড়ি, বারমুড়ার মতো হাঁটু পর্যন্ত বাঘছাল পরা বরকে Jeans পরা মেয়েরা পছন্দ করবে কি?”

ক্ষুদ্রদা -- “মা, তুমি তো অসহায়দের সহায় সম্বল। তোমার বৌমা মানে রমলা চাকলাদারের মাথা যে একেবারে ফাঁকা, সরস্বতীকে বলে একটু বিদ্যা বুদ্ধি ওকে দাও না। আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি তো ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি, কি বলতে কি বলবে!”

মা দুর্গা --- “ওকে যদি দিল্লীর মিরিগু হাউস থেকে পাশ করিয়ে আনতাম, ভাল হোত? পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তোর কাছে রাখতে পারতিস? প্রতিমাসে Jeans এর প্যান্ট কাচার এবং ভরুর লোম তোলার খরচের টাকা যোগান দিতে পারতিস? তার থেকে Cataract বলতে Caterer বলে তাই তো? সে অনেক ভাল।”

ক্ষুদ্রদা -- “আচ্ছা মা, এই যে চারপাশে এত অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, তোমার কি কিছুই করার নেই?”

মা দুর্গা -- “আরে এটা হয়েছে mainly গণশা মানে গণেশের জন্য। ও ক্রমশঃ ওর বাপের মত ল্যাডমাল মানে lethargic হয়ে যাচ্ছে। আমার তো মনে হয় ভুঁড়ি তৈরির প্রতিযোগিতা হলে ও ওর বাপকেও ছাড়িয়ে যাবে। আসলে প্রত্যেক পূজার আগে গণেশের পূজা করতে হয় বলে ওর সংসারটা দিব্যি চলে যাচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে মন দিচ্ছে না। ফলে বিশ্বের ব্যবসায় মন্দা চলছে। কলাবৌটারও কোনো demandই নেই। লক্ষ্মীটাও হয়েছে তেমনি। নিজের সাজগোজ নিয়েই ব্যস্ত, আর নিজের ছোট্ট একটা বাঁপিতে টাকা পয়সা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরে বাবা, বিশ্বের অর্থনীতির দায়িত্ব তো তোর ওপরে, তুই দেখবি না? সরস্বতীও তো বিয়ে করলো না, শেষ বয়সে কে দেখবে? সে যাক্, আজকাল তো অনেকেই বিয়ে না করেও থাকে।”

ক্ষুদ্রদা --- “আমাদের সাংস্কৃতিক অবক্ষয় দেখে কি মা সরস্বতীর মন খারাপ হচ্ছে?”

মা দুর্গা --- “শিক্ষার মান খারাপ হওয়ার জন্য অনেকেই দায়ী। সরস্বতীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কিন্তু ওর মন খারাপ অন্য কারণে। আজকাল কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত শেখে না। এদের পছন্দের গান, “তোমার দেখা নাই রে” বা “ও মামা কোথায় গেলি রে।” তাদের এখানে বিজয়া সম্মেলনে একজন গাইলো মহালয়ার পঞ্চজের গান “নমচণ্ডী, নমচণ্ডী”, কিন্তু সেই বাচ্চা ছেলেটা সনৎ সিংহের “এক একে এক, দুই একে দুই” গানটা গাইলো। আহা মনটা ভরে গেল কিনা বল? কৈলাশে থাকার সময় আমি চান্স পেলেই উত্তম সুচিত্রার সিনেমা দেখি। কিন্তু এখন তো প্রসেনজিৎ ঋতুপর্ণার বই দেখায়, আমি একদম দেখিনা, TVটা বন্ধ কোরে দেই। সরস্বতীর মন খারাপ হবে না?”

ক্ষুদ্রদা --- “মা, তুমি কার্তিককে দিয়ে আমাদের দেশের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশের নিত্য ঝামেলা বন্ধ করিয়ে দিতে পারো না?”

মা দুর্গা --- “কার্তিককে বলে দেখি, তবে কিছু করবে বলে

মনে হয় না। ওর মন মেজাজ খুবই খারাপ, কিছুতেই পাত্রী পছন্দ করতে পারছে না। তাদের জাপানে প্রবাসী ভারতীয়দের কাউকেই ওর মনে ধরছে না। আর জাপানীদের পোশাক বড্ড উগ্র। কলাবৌ-এর মতো হতে বলছি না, মোটামুটি ভদ্রসভ্য হলেই চলবে। স্বর্গের আইন শৃঙ্খলা খুব খারাপ। ওখানকার residentদের চরিত্র আরও খারাপ, অবশ্য কবেই বা ভাল ছিল! মুনি, ঋষিদের স্ত্রীরাও বাদ যায়নি। আমার কেতো মানে তাদের কার্তিক বিয়ে করতেই ভয় পাচ্ছে।”

ক্ষুদ্রদা --- “আচ্ছা! তুমি অসুরকে একদম মেরে ফেলছো না কেন? ওকে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ?”

মা দুর্গা --- “এই বুদ্ধি নিয়ে তোরা দেশ চলাবি? শত্রুকে পুরোপুরি শেষ করতে নেই। অসুরকে শেষ কোরে দিলে আমাকে কেউ পাত্তা দেবে? আমার পূজা হবে? বারোয়ারী পূজার কর্মকর্তাদের সম্বৎসরের খরচ তো

সার্বজনীন দুর্গোৎসব তহবিল থেকেই আসে। পাকিস্তানের সঙ্গে সব সময় যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব না থাকলে তাদের ডিফেন্স মিনিষ্টারের কাজ কি হবে এলাহাবাদের প্রয়াগে দাঁড়িয়ে গঙ্গার আরতি করা? দেশ থেকে চোর ডাকাত উধাও হলে থানার দারোগা কি সিঙ্গুরের মাটিতে আলু চাষ করবে?”

ক্ষুদ্রদা -- “এখানে বিসর্জনের নামে তোমাদের সকলকে প্যাকিং বাস্কের মধ্যে ভরে কোনো একটা জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। তোমাদের দমবন্ধ হয়ে যায় না? কষ্ট হয় না?”

মা দুর্গা -- “কেন রে! তোরা কোলকাতায় কি আমাদের Toyota গাড়ীতে কৈলাসে পাঠাস? জলের মধ্যে ফেলে দিস্ না? তাও আবার কি, জলে ফেলার পরে পাড়ার কতগুলো ছেলে আমাদের গায়ের ওপর চেপে বসে, আমাদের নাকি আর একটুও অধিকার নেই জলে ভেসে থাকার। তোর বুকের ওপর চেপে বসলে কেমন লাগে দেখবি?”

ক্ষুদ্রদার মনে হল বুকের ওপর কিসের যেন চাপ লাগছে বা ধাক্কা লাগছে। চোখ মেলে দেখেন রমলা বৌদি ক্ষুদ্রদাকে ধাক্কা দিচ্ছেন আর বলছেন,

“আরে, আর কতক্ষণ ঘুমোবে? আজ রবিবার, সকলে আসবে বিজয়ার প্রণাম করতে, বাজারে যেতে হবে না? হ্যাঁ গা, কাল রাতে কি স্বপ্ন দেখছিলে? ঘুমের মধ্যে কত কথা বললে, কিছুই বুঝলাম না। তবে মা দুর্গা টুর্গা কিছু বলছিলে মনে হল।”

এতক্ষণ মা দুর্গার সঙ্গে কথা বলার পর কি আর রমলা বৌদির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে?

জাপানে প্রবাসী ভারতীয়দের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত দুর্গা পূজা দেখে, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরে ২০০৮ সালের ১৫ই নভেম্বর ক্ষুদ্রদা রমলা বৌদিকে নিয়ে কোলকাতায় ফিরে এলেন।

খাদ্যের অভিজ্ঞতা

চন্দনা মুখার্জী

খাদ্য মানুষের জীবনের একটা বিশেষ অঙ্গ। বিশেষ করে বাঙালীদের। খাবার নিয়ে আলোচনা করতে আমরা ক্লান্ত হই না, বরং উপভোগই করি। ছেলেবেলা থেকে বড়বেলা অবধি আমিও এই করে আসছি। কথায় বলে 'ফুলটি ফোটে ঘরটি বুঝে' -- কর্তামশাই শিবেশ্বর মুখার্জী খুবই খাদ্যরসিক। ওনার সাথে প্রচুর দেশ-বিদেশ ঘুরেছি এবং প্রচুর দেশ-বিদেশের খাবার খেয়েছি। অভিজ্ঞতাও হয়েছে অনেক। তারই কিছু কিছু জানাতে আজকের এই লেখা।

ছুটিতে ছেলে সিদ্ধার্থ এবং মেয়ে রাণুকে নিয়ে গেলাম রাশিয়ায়। সবাই খুব excited -- হোটেলে থাকা, খাওয়া -- খুব মজা হবে। সকালে breakfast-এ plate-এর উপর একতাল মাংস। অনেকটা আলুসেদ্ধ, মটর সেদ্ধ এবং বিরাট bun রুটি এবং এগুলো গলাধঃকরণের জন্য বিশাল মগে চা বা cold drink। এই পিলে চমকানো খাবার বিশাল দেহ রাশিয়ানদের জন্য হয়তো ঠিক, কারণ চারবেলাই তারা এই খায়, কিন্তু আমাকে আবার এটা দিলে মনে হবে কোনো মাংসের দোকানে ঢুকে গেছি।

যাইহোক, পেটের ক্ষিধে মনে চেপে চীনে খাবারের কথায় আসা যাক। Beijing গিয়ে আসল চীনে খাবার খেতে গিয়ে ভিরমি খেলাম। সমস্ত আলাদা! কোথায় গেল সেই চেনা চেনা গন্ধের fried rice, noodles, chili chicken ইত্যাদি! যে চীনে খাবারে জিবে জল আসত, এখন সেই খাবার দেখে চোখে জল আসছে। কিছুতেই বোঝাতে পারি না কী চাই। কিছুদিন পরে গেলাম জাপানে। পৃথিবীর সবথেকে নামী-দামী শহর সবকিছু পরিষ্কার। চক্চক, ঝক্‌ঝক করছে। Ikebana, Bonsai-এর শহর -- সব সবুজ। মানুষগুলো ছোট ছোট, বাড়িগুলো ছোট ছোট। মজার ব্যাপার, খাবারগুলোও ছোট ছোট। Restaurant-এর বাইরে ছোট ছোট বাসনে সব সাজানো থাকে। দেখে বুঝে order দাও। একটা tray-র উপর অনেকগুলো dish -- নানারকম চাটনী, সস, ভাত,

মাছ, মাংস। কিন্তু খাবার দেখে আবার চিন্তা -- এইটুকু খাবারে পেট ভরবে তো? কি বামেলা -- হয় maxi, নয় mini। এরপর আমেরিকার কথায় আসা যাক। কি বিশাল দেশ! সব কিছুই কি বিশাল! Pizza, Burger, Ice-cream, Drinks -- সবই বিরাট -- magnum size -- খেতে না পারলে ফেলে দাও। No Problem -- পেটকে garbage কোরো না। Boston-এ ভারতীয় রেস্টোরাঁয় Salmon মাছ বেশ করে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে রান্না করে বলে -- ইলিশের substitute। ইলিশের অত কাঁটা বাছার সময় কার আছে? হায় কপাল! আর সব কিছুই Organic খাবার যার স্বাদ খুব কম। Herb-এর প্রচলন খুবই বেশী। দেশী রান্নায় যে herb মিল খায় না, এদের কে বোঝাবে!

London-এ পৌঁছে দেখলাম ওই চেনা খাবারগুলো এক নিমেষে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে। এ বরং মন্দ না। পেট না ভরলে আরেকটা খেয়ে নাও। Europe-এ বেড়াতে গিয়ে বুঝলাম Soup, Salad এবং Baked Food-এর উপকারিতা। কিন্তু ওই শক্ত শক্ত Bunগুলো ওরা খায় কি করে? ছুঁড়ে মারলে নির্ঘাৎ কপাল ফটিবে! Singapore-এর হোটেলে আরেক অভিজ্ঞতা। মৌমাছি ভাজা সাজানো প্লেট নিয়ে এলো delicacy বলে। Newton Road-এর resaurant-এ Turtle Soup খুব বিখ্যাত। কিন্তু Soup bowl-এ কচ্ছপের নখ ভাসছে। দেখে খাওয়া যায়? অবশ্য সেখানে কলাপাতায় মোড়া ভাপা মাছ ভোলা যায় না। Singapore-এ ভারতীয় খাবারের চল প্রচুর -- South Indian, North Indian, এমন কি বাঙালী খাবারও পাওয়া যায়।

জীবনে প্রচুর ঘুরেছি, খেয়েছিও প্রচুর। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অভিজ্ঞতাও হয়েছে। বাড়ি ফিরে ভাত, মুসুর ডাল, আলু সেদ্ধ খেতে পারার অপেক্ষায় থাকতাম। সব কিছু দেখে এবং চেখে মনে হচ্ছে বাঙালী খাবারের তুলনা নেই। ☺

পিরামিডের আশেপাশে কয়েকটি দিন

ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী



হজিগিপ্ট শব্দটা উচ্চারণ করলেই চোখের সামনে ফুটে ওঠে দুটো জিনিষ , এক পিরামিড আর দুই নীল নদ । সেই পিরামিড আর নীল নদের দেশে বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা শুরু হল ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে করতে । মোটামুটি ঠিক হল পনের দিনের টুরে দেখে নেওয়া হবে কায়রো ও সংলগ্ন এলাকা অর্থাৎ গিজা , সাক্সারা প্রভৃতি পিরামিড অধুবিিত অঞ্চল । তারপর নীল রিভার ক্রুজে যাওয়া হবে লাক্সার , এডফু ও আসওয়ান পর্যন্ত । সবশেষে দেখে নেওয়া হবে গ্রীক সাম্রাজ্যের সাক্ষী আলেক্সান্দ্রিয়া । সেই মত দিনক্ষণ ঠিক করে বসে পড়লাম ট্র্যাভেল এজেন্ট , ভিসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে মাসখানেক আগে থেকেই । AETBI এর সাইট থেকে এজেন্ট খুঁজে পাওয়া খুবই সহজ । তেমনি সহজ টোকিও থেকে ইজিপ্টের ভিসা পাওয়াও । যাওয়ার দিন যতই এগিয়ে আসতে থাকে , ততই বাড়তে থাকে ইজিপ্ট নিয়ে আলোচনা । অবশেষে এসে পড়ে সেই দিন , যে দিন সদলবলে গিয়ে পৌঁছাই নারিতা এয়ারপোর্টে । পথে সে রকম কোন বিঘ্ন না ঘটলেও টোকিও থেকে পনের ঘন্টার টানা জার্নি করার পর মনে হল ব্রেক জার্নি করে এলেই বোধহয় ভাল হত ।

কায়রো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যখন নামলাম , তখন স্থানীয় সময় অনুযায়ী ঘড়িতে রাত্রি সাড়ে দশটা । সব কিছু মিটিয়ে বাইরে এসে দেখি আমার নামের প্ল্যাকার্ড নিয়ে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন । আমি কাছে যেতেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন । আমাদের অসুবিধে হবে ভেবে আমাদের ট্র্যাভেল এজেন্ট নিজেই এসেছেন গাড়ী নিয়ে আমাদের হোটেলে পৌঁছে দেবার জন্য । ভদ্রলোকের নাম আহমেদ । আমাদের হোটেল ঠিক হয়েছিল কায়রো শহরের কোলাহল থেকে দূরে , একেবারে পিরামিডের রাজ্যে , গিজায় । হোটেল যাওয়ার পথে দেখে নেওয়া গেল কায়রো শহরের আলোর সাজ । নীল নদকে পাশে রেখেই আমাদের গাড়ী ছুটছিল , কিন্তু রাতের অন্ধকারে ভাল করে কিছু বোঝা যায় নি । পরে নদী পথে লাক্সার থেকে আসওয়ান যাবার সময় দু চোখ ভরে দেখে নিয়েছি নীলের রূপ । স্বচ্ছ টলটলে জল , মাথার ওপর নীল আকাশ , দু পাশে আঁখ গাছের সারি দেখলে গ্রামের কোন শান্ত নদীর কথা মনে পড়ে যায় । তবে নীলের এই শান্ত রূপের পেছনে অনেকটাই অবদান আছে আসওয়ান নদীর বাঁধ যা কিনা সমস্ত ইজিপ্টের বিদ্যুৎ সরবরাহের একমাত্র কেন্দ্র । শুনেছি নীলের জলে হাত দিলে ইজিপ্টে দ্বিতীয় বার ফিরে আসতে হয় । আসওয়ানে সার সার কেলুকার মাঝে বোটে ঘুরতে ঘুরতে বার বার জলে হাত দিয়ে আবার ফিরে আসার অঙ্গীকার করে নিয়েছি ।

যা হোক , মাঝ রাত্রে হোটেলে পৌঁছানোর পর বাকি রাতটুকু বিশ্রাম । পর দিন সকালে ব্রেকফাস্ট করতে বেরিয়ে হোটেলটা ভাল করে ঘুরে দেখলাম । আধুনিক জীবনযাত্রার সমস্ত সুবিধেই বর্তমান । বাইরে সুইমিং পুলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি সামনে

পিরামিড । হঠাৎ করে এত কাছে পিরামিড দেখে প্রথমে বিশ্বাসই হচ্ছিল না । ভাল করে দেখে বুঝলাম , আসলে যত কাছে মনে হচ্ছে ঠিক ততটা কাছে নয় । কখন সামনে থেকে গিয়ে দেখব ভেবে অস্থির হয়ে উঠলাম । ব্রেকফাস্ট করার জন্য তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম । ব্যুফে সিস্টেমে এলাহি আয়োজন । রসনার পরিতৃপ্তির জন্য নানান ইজিপশিয়ান খাবারের সঙ্গে কন্টিনেন্টাল মেনু ।

রিসেপ্শনে আহমেদ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের গাইডের সঙ্গে । মাথায় স্কার্ফ ঢাকা এক মহিলা । নাম সীমা । ভদ্রমহিলা ইজিপ্টোলজিস্ট । এখানে অনেক ইউনিভার্সিটিতে ইজিপ্টোলজি পড়ানো হয় । টুরিষ্ট গাইড হিসেবে ইজিপ্টোলজিস্টের চাহিদা সারা ইজিপ্ট জুড়েই । সীমা গাড়ীতে যেতে যেতেই পিরামিড নিয়ে জানালো অনেক অজানা তথ্য । বিশাল এলাকা নিয়ে গিজার এই পিরামিড রাজ্য । প্রধানতঃ তিনটে গ্রেট পিরামিড আর স্ফিংস্ -- এই নিয়েই গিজা । টিকিট কাটতে হয় এলাকায় ঢোকার জন্য । পিরামিডের ভেতরে ঢোকার জন্য আলাদা টিকিটের ব্যবস্থা ।

ভিতরে ঢুকেই দেখি সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বিশাল এক পিরামিড । দূর থেকে চোখে পড়ছে পিরামিডের পায়ের কাছে লিলিপুট মানুষের আনাগোনা । পাশে একটু দূরে আরেকটা পিরামিড , উচ্চতায় প্রথমটির মাথায় মাথায় । পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম সামনে । সামনের গ্রেট পিরামিড চতুর্থ রাজবংশের ফ্যারাও কিওপ্স্ -এর সৃষ্টি , অন্যটি তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ফ্যারাও কেফেরণের । পিতার প্রতি সম্মান জানানোর জন্য তিনি তাঁর পিরামিডের উচ্চতা কম রেখেছিলেন । কিন্তু কালের স্রোতে কিওপ্স্-এর পিরামিডের মাথার কিছু অংশ ভেঙে পড়ে যায় । সেইজন্য বর্তমানে কেফেরণের পিরামিডই পৃথিবীর উচ্চতম পিরামিড ।

কিওপ্স্-এর পিরামিডটি তৈরি করতে সময় লাগে আনুমানিক কুড়ি বছর । সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ২৫৬০ । ঐ সময় কোথা থেকে এত পাথর জোগাড় হল , কিভাবেই বা সেগুলো পর পর সাজিয়ে নিখুঁত আকৃতির পিরামিড তৈরী হল -- এই নিয়ে চলছে নিরন্তর গবেষণা । আমার চোখে শুধুই মুগ্ধ বিস্ময় । আশেপাশে রয়েছে ছোট ছোট অসংখ্য পিরামিড এবং টেবিলের আকৃতির মাণ্ডাবা । ছোট পিরামিডগুলো রাজপরিবারের আর মাণ্ডাবাগুলো নোবলদের সমাধি । একদম সামনে থেকে না দেখলে বোঝা যায় না কি বিশাল আকৃতি ঐ গ্রেট পিরামিডের । একদম নীচের যে পাথরগুলো বেস্ তৈরী করেছে , সেগুলোর উচ্চতা প্রায় দু মানুষ সমান । কিওপ্স্-এর পিরামিডের সামনের দিকে মাঝামাঝি জায়গায় একটা প্রবেশদ্বারের মত । যুগে যুগে বহু মানুষ চেষ্টা করেছে ঐ পথে পিরামিডের ভেতরে ঢোকার । পাথরের পর পাথর ভাঙতে ভাঙতে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে গেছে সবাই । অবশেষে বিংশ শতকের গোড়ায় আবিষ্কৃত হয় ভেতরে ঢোকার

পথ। সেই পথ এখন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। অন্ধকার সেই সুড়ঙ্গে আধো অন্ধকারে সেই পথ চলে গেছে পিরামিডের গভীরে। কাঠের তৈরী রেলিং ধরে সাবধানে পা ফেলে কিছু দূর নামার পর দেখি সামনে আবার ধাপে ধাপে উঠে গেছে। উচ্চতা কোথাও বেশী



নয় বলে সারাক্ষণই মাথা নীচু করে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়। অবশেষে প্রায় পিরামিডের মাঝামাঝি জায়গায় পথ প্রশস্ত হয়েছে একটা ছোট ঘরের মধ্যে। সম্পূর্ণ নিরাভরণ, ঠাণ্ডা ঘরটিতে একটি মাত্র লাল গ্র্যানাইট পাথরের সারকোফেগাস। ঐ পাথর নাকি আনা হয়েছিল সুদূর দক্ষিণের আসওয়ান থেকে নীল নদ ধরে। কিন্তু কিভাবে ঐ পথে পিরামিডের ভেতরে প্রবেশ করানো হল, কে জানে! সম্ভবত আরও অন্য পথও ছিল।

সমাধিকক্ষিৎ খুব প্রশস্ত না হলেও একজন মৃত মানুষের জন্য যথেষ্ট। ঐ ঘরে ছিলাম বেশ কিছুক্ষণ। ঐ ঘরের মধ্যে পাঁচ হাজার বছর আগেকার এক ফ্যারাও-এর মমি ছিল -- এটা ভাবতেই কেমন একটা রোমাঞ্চ জাগে। ঘরটিতে অক্সিজেন বেশ কম। অল্প অল্প শ্বাসকষ্ট হয়। ওরকম একটা আধোভৌতিক পরিবেশে কেউ কেউ বসে মেডিটেশন করছেন। হাত দিয়ে দেওয়াল ছুঁতেই কেমন একটা শিরশিরানি অনুভূতি; মনে হল আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেকার ইতিহাসকে ছুঁয়ে ফেলছি। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী না হয়েও বার বার মনে হতে লাগল যে ওই ইতিহাসের সঙ্গে আমিও ছিলাম। গাইডের কাছে শুনেছি ওই ঘরে কোন খাবার রাখলে নাকি সেটা নষ্ট হয় না বহুকাল পর্যন্ত। ওখান থেকে পাওয়া মধু ইত্যাদি নাকি নষ্ট হয়নি পাঁচ হাজার বছরেও। আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য হল ঐ ঘরে কোন ভোঁতা ছুরি রাখলে নাকি এক রাত্রের মধ্যেই সেই ছুরি ধারালো হয়ে ওঠে। সত্যি মিথ্যে জানিনা, তবে পিরামিড সম্পর্কে বিস্ময় আরও বেড়ে যে গেল, তাতে সন্দেহ নেই।

কেফেরণের পিরামিডে ঢোকার আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। ঐ পিরামিডের মাথার বেশ কিছু অংশ মসৃণ লাইমস্টোনের তৈরী। সেই কারণেই সম্ভবতঃ ঐ পিরামিডের মাথা আজও অক্ষত। এককালে সমস্ত পিরামিডটিই ঐরকম মসৃণ পাথরে ঢাকা ছিল। অষ্টাদশ রাজবংশের ফ্যারাও দ্বিতীয় র্যামেসিসের নির্দেশে ভাঙা হয় সমস্ত লাইমস্টোন। দ্বিতীয় র্যামেসিস ছিলেন ইজিপ্টের সবচেয়ে প্রভাবশালী ফ্যারাও। ইতিহাস থেকে তিনি সমস্ত ফ্যারাওদের নাম মুছে ফেলে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে তাঁর সে প্রচেষ্টা সর্বাংশে সফল হয় নি। তবে ইজিপ্টের যেখানেই গেছি দ্বিতীয় র্যামেসিসের উজ্জ্বল উপস্থিতি চোখে পড়েছে।

সম্পূর্ণ পিরামিড চত্বরটা এতই বিশাল যে পায়ে হেঁটে সবটা ঘোরা সম্ভব নয়। এক জায়গায় উটের পিঠে চড়ার ব্যবস্থাও রয়েছে নামমাত্র দক্ষিণায়। সদলবলে উটে চড়ে স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে গেল সোনার কেল্লার লালমোহনবাবুর অভিজ্ঞতা। অত উপর থেকে বেশ ভয় ভয়ই করে। বিশেষ করে উটের ওঠা আর নামার সময় প্রাণ হাতে করে বসে থাকতে হয়। উটপর্ব সারা হলে দেখতে গেলাম ম্যাকারনেস-এর পিরামিড। আলাদা করে বিশেষ কিছু চোখে পড়লো না। কেবল আকার আর উচ্চতায় অন্য দুই পিরামিডের থেকে ছোট। তবে ঐ জায়গাটি বাকী দুই পিরামিডের একসঙ্গে ছবি তোলার জন্য আদর্শ জায়গা।

স্ফিংস দেখার জন্য আবারও গাড়ী করে সম্পূর্ণ অন্য দিকে যেতে হল। স্ফিংসের সামনে থেকে দেখলে চোখে পড়ে পেছনেই কেফেরণের পিরামিড। দেখে মনে হয় কেফেরণের পিরামিড রক্ষা করার জন্যই ঐ অর্ধেক মানুষ আর সিংহের দেহাকৃতির মূর্তি বসে আছে। জানলাম স্ফিংস নাকি কেফেরণেরই তৈরী। সামনে থেকে দেখলে স্ফিংস-এর পশুরাজের আদলে তৈরী দেহাকৃতি বিশেষ বোঝা যায় না। পাশের একটি সিঁড়ি দিয়ে খুব কাছাকাছি



গিয়ে দেখা যায় সেই অপূর্ব দেহাবয়ব। পাথরের তৈরী অসাধারণ প্রাচীনতম ভাস্কর্য। এটাও ছবি তোলার জন্য আদর্শ জায়গা। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের ক্যামেরা সচল অবশ্য সর্বত্রই।

পিরামিড দেখে ফেরার পথে দেখে নেওয়া গেল প্যাপিরাস ইন্সটিউট আর সুগন্ধি ফ্যাকটরি। প্যাপিরাস ইন্সটিউটে আছে হাতে কলমে প্যাপিরাস কাগজ তৈরী করতে শেখার ব্যবস্থা। রয়েছে ইজিপ্টের বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা প্যাপিরাসের উপর

অসম্ভব সুন্দর চিত্রসভার। ফ্যারাওদের বিভিন্ন আখ্যানের ভিত্তিতে তৈরী এক একটা ছবি যেন এক একটা গল্প। মেমেন্টো হিসেবে কিনে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। শক্ত কার্ডবোর্ডের ভিতরে রোল করে নিয়ে যাওয়া যায় সহজেই। ইজিপ্ট যে সুগন্ধির জন্য বিখ্যাত জানা ছিল না। ফ্যাকটরির মালকিন যত্ন করে বোঝান বিভিন্ন সুগন্ধির উপকারিতা। কেমন করে যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ঐ সমস্ত সুগন্ধি কেনার জন্য কোন আদার নেই, তবে দেখলে না কিনে চলে আসা মুশকিল।

রাত্রে ঠিক হল নীল নদের উপর ক্রুজ-এর ডিনার করা হবে। নদীর উপর চলমান জাহাজে বিলাসবহুল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। অতিরিক্ত পাওনা বেলি ড্যান্সিং আর তানুরা শো -- জিপসি সম্প্রদায়ের স্ট্রু দুই অসাধারণ নৃত্য কর্ম। নাচতে নাচতে দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণে বাধ্য করে। এককথায় অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা।

গিজার গ্রেট পিরামিড হল পাঁচ হাজার বছর আগেকার ইজিপশিয়ান আর্কিটেকচারের এক চূড়ান্ত নিদর্শন। কিন্তু একবারেই এই পিরামিডের ডিজাইন সম্ভব হয় নি। হয়েছিল ধাপে ধাপে। তার সমস্ত নিদর্শনই বর্তমান। তবে তা দেখার জন্য যেতে হয়েছিল সাক্কারা। আমাদের হোটেল থেকে বেশ খানিকটা দূর। গাড়ীতে যেতে যেতে শুনলাম সাক্কারা ও মেমফিস সম্পর্কে নানান তথ্য। মেমফিস হল অ্যাক্রোপলিস অর্থাৎ জীবিত মানুষের স্থান আর সাক্কারা, গিজা এগুলো হল নেক্রোপলিস বা মৃতের জায়গা।

আশ্চর্যের বিষয় হল, ফ্যারাওরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নিয়ে এতবেশী চিন্তিত ছিলেন যে বেঁচে থাকাকালীন নিজেদের বাসস্থান নিয়ে ততটা মন দেন নি। তার ফলে আজকের ইজিপ্টে নেক্রোপলিসের ছড়াছড়ি সর্বত্র, অথচ অ্যাক্রোপলিসের কোন নিদর্শনই সেরকমভাবে চোখে পড়ে না। মেমফিসে দ্বিতীয় র্যামেসিসের কয়েকটি মূর্তি ছাড়া আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। এক জায়গায় পাওয়া দ্বিতীয় র্যামেসিসের এক বিশাল শায়িত মূর্তিকে ঘিরে এক হল তৈরী করে দেখার ব্যবস্থা করা আছে। সেই বিশাল মূর্তিটি এক কথায় অসাধারণ। শরীরের প্রতিটি পেশী, এমনকি মুখের প্রতিটি রেখা নিখুঁতভাবে পাথর কেটে বানানো। সাক্কারায় রয়েছে প্রথম পিরামিড তৈরীর প্রচেষ্টা, স্টেপ পিরামিড। ইজিপ্টে যে মরুভূমি রয়েছে, সাক্কারায় গেলে বোঝা যায়। দূর থেকে দেখা যায় বালিয়াড়ি। মার্চ মাসেও রদুরে তাকিয়ে থাকা যায় না। ফেব্রার পথে গাড়ীতে ইজিপশিয়ান গান শুনে খুব চেনা সুর বলে মনে হল। আসলে বলিউডের যে সমস্ত গান সুফী গানের অনুপ্রেরণায় তৈরী, সেগুলোর সাথে ইজিপশিয়ান গানের অদ্ভুত মিল! জিজ্জেস করে জানলাম যে বলিউডের সিনেমা, গান এবং সিনেমা আর্টিস্টরাও ইজিপ্টে ভীষণ জনপ্রিয়।

সন্ধ্যে নামার আগেই পৌঁছে যাই গিজার গ্রেট পিরামিডের সামনে লাইট এ্যান্ড সাউন্ড শো-র গ্যালারীতে। তিনটি পিরামিড আর স্ফিংসের উপর আলো আর লেজারের খেলা, তার সঙ্গে অডিওভিশুয়াল। বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে ফ্যারাওদের উত্থান, পিরামিড সৃষ্টি, মিমিফিকেশন, নবীন ফ্যারাও-এর অভিষেক, বহিঃশত্রুর আক্রমণ -- দেখতে দেখতে কখন যেন ইতিহাসের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। এক ঘন্টার এই শো সারা জীবনের এক অনন্য

সম্পদ হয়ে রইল।

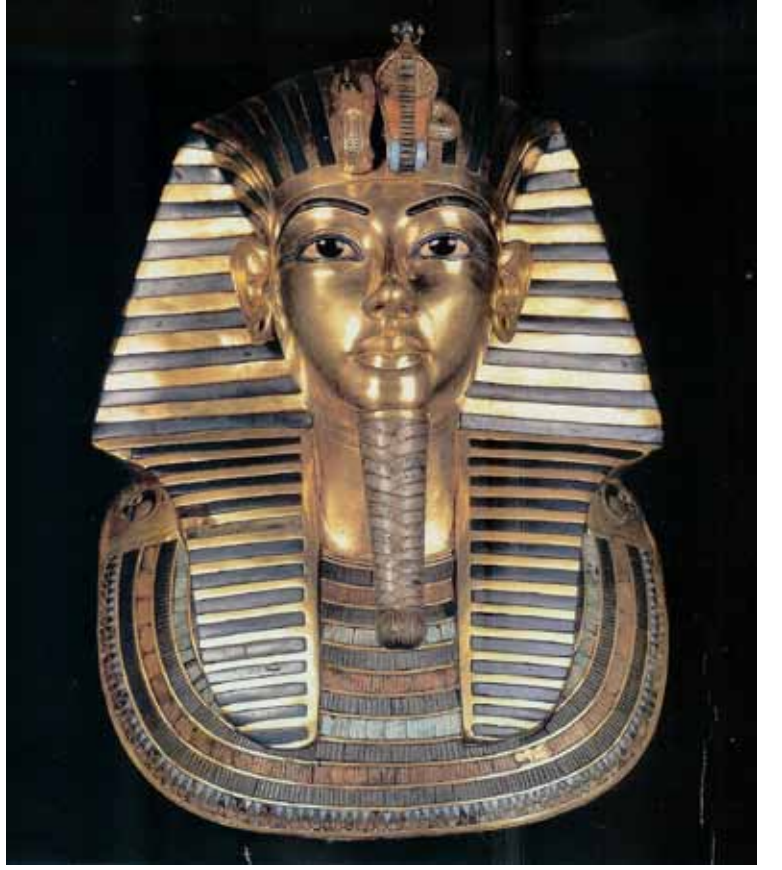
পরদিন সকালে খান-ই-খলিলি বাজার দেখার আয়োজন। পথে দেখে নেওয়া হল সিটাডেল আর অ্যালাবেস্টার মসজিদ। সিটাডেল বানানো হয়েছিল মহম্মদ আলীর আমলে ইজিপ্টকে বিদেশী শক্তির আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে। পাথরের তৈরী উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দুর্গটি সম্রম জাগায়। ভেতরে অ্যালাবেস্টার পাথরের মসজিদ। পরে দক্ষিণ ইজিপ্টে গিয়ে দেখেছি ঐ পাথরের তৈরী ভাস্কর্য। সাদা পাথরের মূর্তিগুলো এতই হালকা যে পাথরের বলে মনে হয় না।

বাজারের পথে রাস্তার ধারের পার্কে দেখি প্রতি বেঞ্চার পাশে একটি করে হুকো রাখা আছে। বেশ মজা লাগলো দেখে। যে কেউ যখন খুশী ব্যবহার করতে পারে পার্কের নিরিবিলিতে। আরও অবাক লাগলো শুনে যে ইজিপ্টেও ওটা হুকো নামেই পরিচিত। খান-ই-খলিলি বাজারটি বেশ বড়। চারদিকে অজস্র গলি চলে গেছে। কলকাতার বড়বাজারের কথা মনে পড়ে যায়। দোকানে প্রথমে যেটা চোখে পড়ে তা হল নানান আকারের নানান রঙের হুকো সাজানো। এছাড়া রয়েছে ব্রাসের তৈরী অসংখ্য মূর্তি আর সুগন্ধি। বিভিন্ন দোকান থেকে বেরিয়ে এসে প্রায় হাত ধরে দোকানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে সর্বত্র। তার মধ্যেই হঠাৎ দোকান ছেড়ে সবাই মিলে রাস্তা বন্ধ করে বসে পড়লো মধ্যাহ্নকালীন নমাজ পড়তে। সময়ের অভাবে ভাল করে ঘোরা না হলেও একটা ছবি নিয়ে গেল মনের মধ্যে। মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হল ইজিপশিয়ান রেস্টুরেন্টে। নাম অচেনা হলেও বেশ কিছু খাবারে ভারতীয় ছাপ রয়েছে। তাছাড়া ইজিপ্টের নিজস্ব মিষ্টান্ন বাঙালী রসনাকেও তৃপ্ত করার ক্ষমতা রাখে।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম অফ অ্যান্টিকুইটি। বাইরে থেকে এই মিউজিয়াম আর পাঁচটা সাধারণ মিউজিয়ামের মতই। গেট দিয়ে ঢুকেই দু পাশে দুটো বিশাল পাথরের মূর্তি। এর মধ্যে একটি র্যামেসিসের। মিউজিয়ামটি দোতলা। শুনলাম প্রায় সাত লক্ষ দেখার সামগ্রী রয়েছে এই দোতলা বাড়ীটায়। হাতে মাত্র তিন ঘন্টা সময় -- ভেবেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। গাইডের সাহায্য ছাড়া এত কম সময়ে কিছু ভাল করে দেখাই অসম্ভব। সীমা আমাদের সঙ্গে করে প্রথম দিকে ঘুরে ঘুরে সমস্ত মিউজিয়ামের নকশাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিল। কি ভাবে প্রাচীন, মধ্য আর নতুন রাজতন্ত্রের সামগ্রী ভাগ করা আছে, কোথায় সাধারণ মানুষের মূর্তি আছে, কোথায় কোথায় বিশেষ ভাবে রক্ষিত ব্যক্তিবিশেষের সামগ্রী। মূর্তি সে ফ্যারাও-এর হোক, অথবা সাধারণ মানুষের, দাঁড়ানো অবস্থায় প্রত্যেক মূর্তিরই একটা পা সামনের দিকে এগোনো। বিভিন্ন জন বিভিন্ন কারণ বললেও মনে হয় বড় বড় মূর্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই ঐ রকম করে বানানো হয়েছিল। এক তলায় চোখে পড়ার মত মূর্তি হল রানী হাচিপসুত-এর মূর্তি। ঐ রানী ক্ষমতাবলে সিংহাসন দখল করে নিজেই ফ্যারাও বলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অসংখ্য গল্প তাঁর ক্ষমতা দখল আর জীবনের নানান ঘটনা নিয়ে ফ্যারাও-এর মূর্তির বৈশিষ্ট্য হল মাথার মুকুট আর দাড়ি। ঐ দাড়ি যদি সোজা থাকে তাহলে ঐ মূর্তি ফ্যারাও-এর জীবিতকালের মধ্যেই বানানো। কিন্তু যদি ঐ দাড়ি সামনের দিকে ওঠানো থাকে, তার মানে ঐ মূর্তি ফ্যারাও-এর মৃত্যুর পর বানানো এবং সেই মূর্তি দেবতার

সমতুল্য । আশ্চর্যের বিষয় হল রানী হাচিপসুত-এর মূর্তিরও মুখে সোজা দাড়ি , অর্থাৎ উনি যে ফ্যারাও এবং জীবিতকালেই ঐ মূর্তি বানানো , সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ।

তবে মিউজিয়ামের প্রধান আকর্ষণ দুটি । একটি তুতান খামেনের সামগ্রী , অন্যটি মমি কক্ষ । ভ্যালি অফ কিঙ্গস্-এ তুতান খামেনের সমাধি আবিষ্কারের পর থেকেই সারা পৃথিবীর লোক জানে তুতান খামেনের কথা । খুব অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন এবং বহুদিন কেউ জানতো না ঐ সমাধির খোঁজ । যেখানে অন্যান্য সমাধি লুণ্ঠিত হওয়া ফলে প্রায় কোন সামগ্রীই পাওয়া যায় নি , সেখানে তুতান খামেনের সমাধির সমস্ত কিছুই অক্ষত ছিল । ঐ সমাধি থেকে প্রাপ্ত সামগ্রী দেখেই বোঝা যায় এক একটা সমাধি কক্ষে কি পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত থাকতো । ঐ সমাধি কক্ষের সামগ্রী দোতলার একটি অলিন্দে রাখা আর তুতান খামেনের নিজস্ব সম্পদ একটি আলাদা কক্ষে রাখা । প্রথমেই এক বিশাল আকৃতির ঘরের আকারের বাস্ক , সোনার পাতে মোড়া নানান দামী পাথরে সজ্জিত । সেই বাস্কের ভিতর অনুরূপ আরও দুটি বাস্ক , একটির ভিতর আর একটি । সবশেষে তুতান খামেনের সারকোফেগাস যেটি কক্ষের মধ্যে রাখা । তুতান খামেনের আদলে



তৈরী এই সারকোফেগাসটিও সোনায়ে মোড়া । সেই সিন্দুকের মত সারকোফেগাসের ভেতরে তুলনায় ছোট কিন্তু আরও সুন্দর একটি সারকোফেগাস । মমির মুখোশটি আলাদা করে দেখার মত । এগারো কিলোগ্রাম সোনায়ে তৈরী মুখোশটি তুতান খামেনের মুখের আদলে তৈরী । তুতান খামেনের যে ছবি সর্বত্র দেখা যায় তা ঐ মুখোশেরই ছবি ।

মমি কক্ষে ঢোকানোর জন্য আলাদা টিকিটের ব্যবস্থা । ভেতরে ঢুকে অদ্ভুত এক অনুভূতি হতে থাকে । মৃদু আলোর ঠাণ্ডা হল-এ সারি সারি কাঁচের কফিনে একের পর এক ফ্যারাও-এর মমি পর পর সাজানো । কারোরই বয়স কয়েক হাজার বছরের কম নয় । প্রতাপশালী সেইসব ফ্যারাওদের মমি কেমন দেখতে হবে , কোন ধারণাই ছিল না । হঠাৎ করে দেখলে মাটির তৈরী মানুষের মূর্তি বলে ভুল হয় । ভাল করে দেখলে নখ , চুল ইত্যাদি দেখে

ধীরে ধীরে রক্তমাংসের শরীরের আদল ফুটে ওঠে । এদের মধ্যে দ্বিতীয় র্যামেসিসের মমি আলাদা করে চোখে পড়ে । লম্বায় প্রায় ছ ফুট ছিলেন বলে মনে হয় । চেহারার ব্যক্তিত্ব যেন মমির মধ্যেও ফুটে রয়েছে । কয়েকটি মমির সারা শরীর মোড়া রয়েছে ব্যাল্ডেজে , ঠিক যেমনটি ছিল সমাধির মধ্যে । তুতান খামেনের মমি দেখার ইচ্ছে ছিল । দূর্ভাগ্যক্রমে ঐ সময় সেটা সংশোধনের জন্য অনুপস্থিত ছিল । মিউজিয়ামে ক্যামেরা নিয়ে ঢোকা নিষেধ । দু চোখ ভরে যতটা দেখে নেওয়া সম্ভব দেখে নিয়েছি । তিন ঘন্টা দৌড়ে বেড়িয়েও সমস্ত কিছু ভাল করে না দেখার আফশোস রয়ে গেল । বেরিয়ে এসে সীমাকে বিদায় জানানোর পালা । আমাদের কায়রো শহরের প্রাথমিক ভ্রমণ সমাপ্তির পথে । এর পর নতুন গাইড , নতুন জায়গা । চললাম ট্রেনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ইজিপ্টের ইতিহাসের রাজ্যে পা রাখার জন্যে ॥

রিকশায় চড়ে যাই হাসনাহেনা দেখতে

কাজুহিরো ওয়াতানাবে

কি ছুদিন আগে একটি বাংলা চলচ্চিত্রের ডিভিডি পয়েছি। সন্দীপ রায়ের পরিচালনায় নিশি যাপন। ডিভিডির ওপর নায়ক-নায়িকার ছবির পাশে ইংরেজী হরফে চলচ্চিত্রের টাইটেল লেখা আছে। আমার স্ত্রী ডিভিডিখানা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখছিল। তারপরে জিজ্ঞাসা করল ফিল্মটি জাপানের রেলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিনা। প্রশ্নের মানে বুঝতে না পেরে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, “তোমার এ রকম মনে হল কেন?” ও উত্তরে বলল, “ছবিটা JR West Japanকে নিয়ে, তাই না?” আমার স্ত্রীর বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। ডিভিডির কেসে ইংরেজীতে লেখা Nishi Japan কথাটাকে ও ভুল করে পড়েছে Nishi Japan অর্থাৎ West Japan! আর West Japan ধারণা করে ও জাপান রেলের পশ্চিম জাপান কম্পানীর কথা ভেবেছে।

কোনো কোনো বাংলা ও জাপানী শব্দে অদ্ভুত মিল আছে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চারণ এক হলেও মানে আলাদা, যেমন জাপানী নিশি (পশ্চিম) আর বাংলা নিশি (রাত্রি)। তবে সংখ্যায় কম হলেও কিছু বাংলা শব্দ জাপানী ভাষা থেকে আমদানী করা হয়েছে। ফলে সেগুলোর অর্থ এবং উচ্চারণ এক অথবা কাছাকাছি। এর উজ্জ্বল উদাহরণ “রিকশা”।

রিকশা শব্দটার উৎপত্তি যে জাপানে, সে কথা হয়তো কারুর অজানা নয়। ১৮৭১ সালের ২২ শে মার্চ ইয়োসুকে ইয়ুমি, তোকুজিরো সুয়ুকি এবং কোসুকে তাকাইয়ামা, এই তিনজন তৎকালীন টোকিও জেলা সরকারের কাছে নতুন ধরণের গাড়ীর পেটেন্ট দাবি করে যে দলিলপত্র দাখিল করেছিলেন, তাতে জিনরিকিশার বর্ণনা পাওয়া যায়। এর পাঁচ বছর পর দাইসুকে আকিতা আদি জিনরিকিশার আংশিক পরিবর্তন করলে এই হাতে টানা গাড়ী বর্তমান আকার ধারণ করে। সে বছরই সিঙ্গাপুর ও ভারতের মতো দেশে জিনরিকিশার রপ্তানী শুরু হয় বলে জানা গেছে। জিনরিকিশা শব্দটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। জিন মানে মানুষ, রিকি মানে শক্তি আর শা-র অর্থ গাড়ী বা যান। নামটিতে নতুন গাড়ীর বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে তুলে ধরা হলেও বেশী লম্বা বলে উচ্চারণ করতে অসুবিধা হোত, সেই কারণে লোকের মুখে মুখে নামটি পরিবর্তিত হয়ে জিনরিকি বা রিকিশা কথাটার প্রচলন হয়। বলাইবাছল্য, এই রিকিশা নামটি বাংলায় প্রবেশ কোরে সেখানকার লোকদের দৈনন্দিন জীবনে এবং সেই সঙ্গে অভিধানে এক দৃঢ় স্থান লাভ করে। এই হোল বাংলা সংস্কৃতিতে একটি জাপানী জিনিস প্রবেশের উপাখ্যান।

অর্থাৎ রিকিশার বেলায় এই দুই চাকার গাড়ীটা কিভাবে সমুদ্র পার হয়ে শেষ পর্যন্ত বাংলার মাটিতে পা রাখল, সেই ইতিহাসের রেকর্ড পাওয়া যায়। কিন্তু হাসনাহেনার ক্ষেত্রে?

সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত সংসদ বাংলা অভিধানের পঞ্চম সংস্করণে হাসনাহেনার বর্ণনা মেলে। অবশ্য এতে হাসনাহেনাকে হাসনুহানা অথবা হাসনোহানা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক, এই অভিধান অনুযায়ী হাসনাহেনা হচ্ছে ছোট সাদা সুগন্ধি ফুলবিশেষ।



তারপর লেখা আছে, “জাপ-হাসনোহানা” অর্থাৎ শব্দটি এসেছে জাপানী ভাষা থেকে। তাহলে তো জাপানে একই নাম বহনকারী কোনো গাছ বা ফুল থাকার কথা? হ্যাঁ, আছে বটে। কিন্তু সমস্যা হল, অভিধানে হাসনোহানার বর্ণনার সঙ্গে জাপানে যে ফুল সেই নামে পরিচিত, তার চেহারায় কোনো মিল নেই।

সাহিত্য সংসদের বাংলা অভিধান অনুসারে এই ফুলের ল্যাটিন নাম *Cestrum nocturnum*। দেশ নির্বিশেষে ল্যাটিন নাম একই থাকে। তাই ল্যাটিন নামের ভিত্তিতে এই ফুলের জাপানী নাম খুঁজলাম। তাতে দেখা গেল জাপানে একে বলা হয় ইয়াকোও - বোকু, যার আক্ষরিক অর্থ রাতে সুগন্ধ ছড়ানো গাছ। উচ্চ অঞ্চলের উদ্ভিদ বলে জাপানে এই গাছের দেখা তেমন একটা মেলে না। সে যাইহোক, আমরা (জাপানীরা) যে ফুলকে হাসনোহানা বলে জানি, তা কখনো ইয়াকোও-বোকু হতে পারে না, কারণ হাসনোহানার বাংলা নাম পদ্ম। সাধারণত পদ্মকে হাসু বলা হয়ে থাকে। তবে সঠিকভাবে বললে হাসু শব্দটির দ্বারা ফুল, গাছ, পাতা সমেত পদ্মের গোটা অংশকেই বোঝানো হয়। তাই শুধু ফুলকে বোঝাতে চাইলে বলতে হয় “হাসনোহানা”। এই একই নিয়ম অন্যান্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন, সেই বিখ্যাত “সাকুরা” বা চেরি; শুধু সাকুরা বললে কিন্তু চেরি গাছও বোঝাতে পারে, তাই নির্দিষ্ট করে চেরি ফুলের কথা বলতে চাইলে, “সাকুরা নো হানা” বলতে হয়।

সে যাইহোক, হাসু (পদ্ম) বঙ্গ ভূমিতে গিয়ে সাদা সুগন্ধি ফুলে পরিণত হল কি করে? দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, হাতের কাছে যত বইপত্র আর ইন্টারনেট থেকে তথ্য যোগাড় করতে



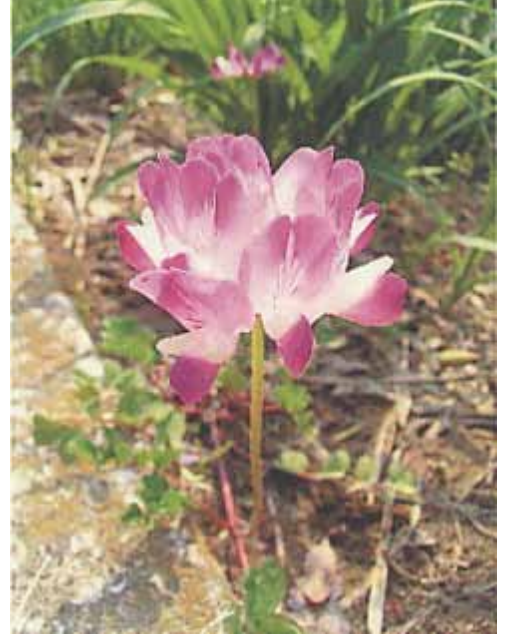
পেরেছি , সেগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজেও এর সদুত্তর পাইনি ।

আরেকটা সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখলাম । সেটি হল “রেঙ্গে-সোও ” । জানেন হয়তো প্রত্যেকটি চীনা অক্ষর বা কাঞ্জি একাধিকভাবে পড়া যায় । হাসু যে কাঞ্জি দিয়ে লেখা হয় , তাকে আবার “রেন ” পড়া হয় এবং “হানা ” বা ফুল প্রকাশক অক্ষরের উচ্চারণ কখনো কখনো হয় “গে ” । অর্থাৎ “রেঙ্গে ” মানে পদ্ম ফুল । পদ্ম ফুলের নাম বহন করলেও রেঙ্গে-সোও আসলে এক ধরণের ঘাস । বসন্তকালে ধানের চারা রোপণের কাজ শুরু হওয়ার আগে দেখা যায় ধান ক্ষেত রেঙ্গে-সোওর ফুলে আবৃত হয়ে আছে । ছোট্ট ফুল , তবে ফুলের আকৃতি পদ্ম ফুলের মত বলেই নাকি এই নামকরণ । কিন্তু এর রঙ হালকা বেগুনী আর এতে বিশেষ গন্ধ থাকে না । তাই এই ফুলের সাথে হাসনাহেনার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না ।

সুতরাং রহস্য শেষপর্যন্ত রহস্যই রয়ে গেছে । পাঠকদের

মধ্যে কেউ যদি হাসনাহেনার জাপান থেকে বঙ্গ ভূমিতে ভ্রমণের ইতিবৃত্ত আমাকে জানাতে পারেন , বাধিত হব ।

এই পর্যন্ত লেখার পর একটা কথা মনে পড়ে গেল । দক্ষিণ জাপানের ওকিনাওয়ার আঞ্চলিক ভাষায় নিশি অর্থাৎ পশ্চিমের অর্থ প্রকাশকারী কাঞ্জিকে কখনো কখনো “ইরি ” পড়া হয় , আর এই ইরি-র মানে ডুবে যাওয়া , অর্থাৎ সূর্য ডুবে যাওয়া । যেহেতু সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায় , তাই নিশি মানে ইরি । আর সূর্য ডুবে গেলে রাতের অন্ধকার নেমে আসে । তাহলে ? তাহলে

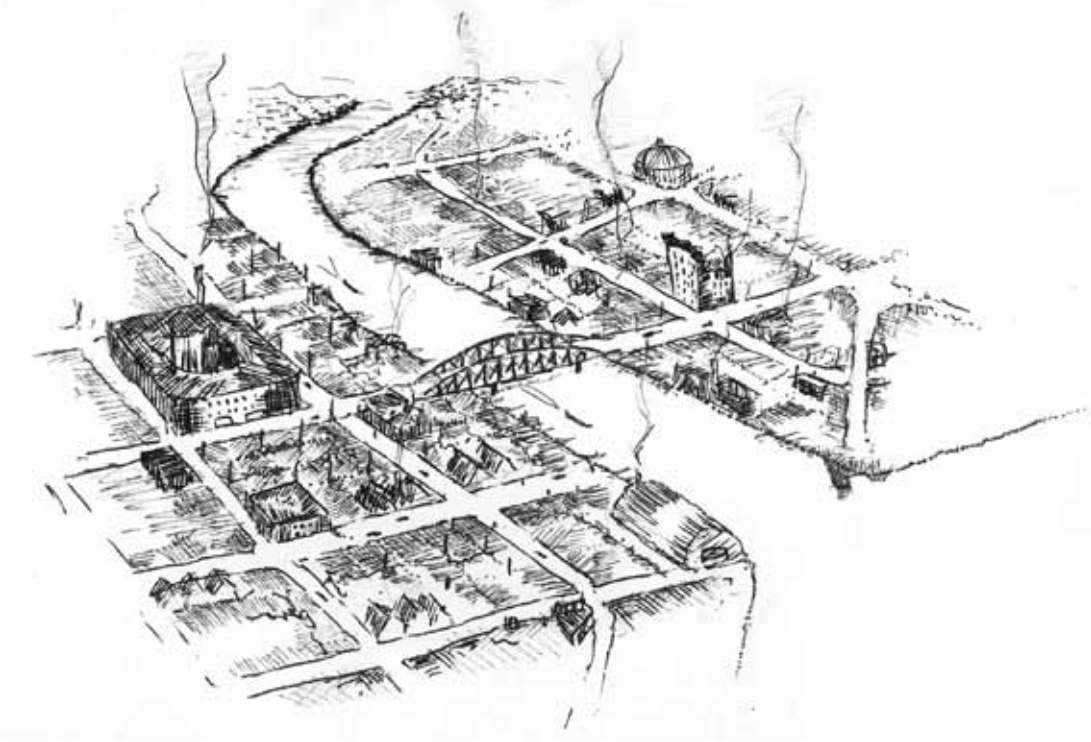


কি জাপানী নিশি বাংলা নিশি-র মধ্যে সাদৃশ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ? ৯

শিতামাচি

(ফুমিকো হায়াশির ছোট গল্প শিতামাচি-র অনুবাদ)

রুমা গুপ্ত



১

শীতের দুপুর, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। রিও পিঠে একটা বড় ব্যাগ ঝুলিয়ে ফুটপাথ ধরে জোর পায় হাঁটছে। পাশে বড় বড় অফিস ভবনের ছাদে ম্লান রোদের আলো। হাঁটতে হাঁটতে রিও কখনও ভবনগুলোর দিকে, কখনও বা ফুটপাথের ধারে থামিয়ে রাখা গাড়ীগুলোর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়। টোকিওর শিতামাচি এলাকায় এখনও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ফেলা বোমার ক্ষতচিহ্ন বর্তমান। এক জায়গায় স্তূপীকৃত একরাশ লোহার টুকরো, তার পাশে কাঁচের দরজাওয়ালা একখানা গুমটিঘর। রিও দেখতে পায় ঘর গরম করার জন্য ভেতরে লোহার উনুনে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তাপে কাঠ ফাটার শব্দ বাইরে দাঁড়িয়েও শোনা যাচ্ছে। বুক থেকে পা পর্যন্ত লম্বা প্লাস্টিকের এপ্রোন পরে, মাথায় লাল রুমালের ফেড়ি বেঁধে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে ঘরের সামনে। দীর্ঘদেহী এই পুরুষের চেহারায় এমন কিছু আছে যা দেখে রিও সাহস করে কয়েক পা এগিয়ে যায়।

-- 'ভাল চা পাতা আছে। নেবেন?'

-- 'চা পাতা?'

-- 'হ্যাঁ। শিয়ুওকার চা।' একটু হাসে রিও, তারপর দরজার কাছে পিঠের ব্যাগটা নামিয়ে রাখে। ভেতরে লোহার উনুনে গন্ধে আগুন। উনুনের ওপর লোহার ডাণ্ডায় ঝোলানো একটা জল ভরা কেটলি।

-- 'কিছু যদি মনে না করেন, আগুনে হাত দুটো অল্প সেক্টে নিতে পারি? আজ যা হাড় কাঁপানো বাতাস, তার মধ্যে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি।'

-- 'নিশ্চয়ই। ভেতরে বসুন।' দরাজ গলায় অনুমতি দিয়ে পুরুষটি রিওর দিকে একটা টুল এগিয়ে দেয়। নিজে গিয়ে বসে ঘরের কোনায় রাখা প্যাকিং বাক্সের ওপর। রিও একটু আড়ষ্ট হয়ে আগুনের পাশে মেঝেতেই বসে পড়ে। হাত সেক্টে সেক্টে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার শরীর গরম হয়ে ওঠে, মুখে লালচে আভা। অতি সাধারণ পোশাকেও রিওকে দেখায় বেশ সুন্দর।

-- 'টলে আরাম করে বসলেই তো হোত।' রিওকে এক পলক দেখে নিয়ে পুরুষটি জানতে চায়, 'ঘুরে ঘুরে চা বিক্রি করেন বুঝি?'

-- 'হ্যাঁ, চা বিক্রি করেই সংসার চালাই। শিতামাচি এলাকাটা ভাল শুনে ভোরবেলা থেকে ঘুরছি। বিক্রি হয়েছে মোটে এক প্যাকেট। ফিরেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু ভাবলাম কোথাও বসে দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিলে হোত।'

-- 'তা এখানে বসে খেয়ে নিলেই তো হয়। বিক্রি হয়নি বলে মন খারাপ করবেন না। সবই কপাল! দেখবেন হয়তো কাল ভাল বিক্রি হবে।'

উনুনের ওপর জলভরা ঝুলন্ত কেটলির মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে হুইসিলের শব্দ করে। পুরুষটি তাড়াতাড়ি ডাণ্ডা থেকে কেটলিটা বার কোরে নিয়ে এগিয়ে যায় টেবিলের দিকে। সেই ফাঁকে রিও সমস্ত ঘরটায় একবার চোখ ঝুলিয়ে নেয়। কাঠের সিলিং-এ প্রচুর ঝুল জমেছে, জানালার পাশে একটা ব্ল্যাকবোর্ড, তাকের

ওপর ঠাকুরের আসনে সাসাকির ডাল সাজানো। পুরুষটি ততক্ষণে প্যাকেট খুলে এক টুকরো কডমাছ বার করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরটা ঝলশানো মাছের সুগন্ধে ভরে ওঠে।

-- 'আসুন, একসাথে দুপুরের খাওয়া সেরে নি।' উনুনের ওপর কডমাছের টুকরোটা উল্টে দিতে দিতে বলে পুরুষটি। রিও ব্যাগ থেকে টিফিন বাক্স বার করে নিয়ে টুলে গিয়ে বসে।

-- 'জিনিস ফেরি করতে বেরিয়ে সব সময় কি আর ভাল অভিজ্ঞতা হয়! তা, একশো গ্রাম চা বিক্রি করে কত পান?'

-- 'পঁয়ত্রিশ ইয়েন মতো পেলে কিছু লাভ থাকে। তবে আমি যাদের কাছ থেকে কিনি তারা আকছার বাজে চা মিশিয়ে দেয়। তাতে একশো গ্রামে ত্রিশ ইয়েনের বেশী পাওয়া যায় না।' রিও টিফিন বাক্স খুলে খেতে শুরু করে। খাবার বলতে দু খানা ছোট মাছ, অল্প আচার আর কিছু সজি সেন্দ্র।

-- 'থাকেন কোথায়?' পুরুষটি জানতে চায়।

-- 'শিতায়া এলাকায়। অল্পদিন হয় এসেছি, টোকিওর কিছুই বলতে গেলে জানিনা। উঠেছি এক বন্ধুর বাড়ীতে।'

কডের দু দিকই ভাল ভাবে ঝলশানো হয়েছে। মাছটাকে উনুন থেকে তুলে নিয়ে দুভাগ কোরে, এক ভাগ কিছুটা আলু সেন্দ্র আর ভাত সমেত রিওর দিকে এগিয়ে দেয় পুরুষটি। একটু হেসে রিও মাথা ঝুকিয়ে ধন্যবাদ জানায়। তারপর ব্যাগ থেকে একখানা চায়ের প্যাকেট বার করে, তা থেকে কিছুটা চা এক টুকরো কাগজে ঢেলে পুরুষটির হাতে দিয়ে বলে, 'কেটলিতে ঢেলে দিন।'

হেসে মাথা নাড়ায় পুরুষটি, 'না না, এ যে খুব দামী চা।' এবার রিও নিজেই উঠে ঢাকনা খুলে কেটলির মধ্যে পাতাগুলো ঢেলে দেয়। পুরুষটি বাধা দেওয়ার সুযোগ না পেয়ে অগত্যা উঠে গিয়ে দু খানা কাপ নিয়ে আসে।

-- 'স্বামীর কথা তো কিছু বলছেন না, আপনার বিয়ে হয়নি?'

-- 'হয়েছে, তবে সে আছে সাইবেরিয়ায়। তাই রুজিরোজগারের জন্য আমাকেই পথে বেরোতে হয়।' প্রসঙ্গ উঠতে স্বামীর কথা মনে হোল রিওর। এই সেই ব্যক্তি, একটানা ছ'বছর যার কোনও খবর জানেনা। দীর্ঘ বিচ্ছেদের ফলে তার চেহারা, অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর -- সবই কেমন ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে রিওর স্মৃতিতে। প্রতিদিন ভোরে রিওর ঘুম ভাঙে মনে এক অদ্ভুত শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতার বেদনা নিয়ে। কোথায় গেল মানুষটা? সাইবেরিয়ার প্রচণ্ড শীতে জমে কি ভুত হয়ে গেল? নাকি তুষার ঝড়ে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাসের মতই মিলিয়ে গেল সে? এখন যুদ্ধের কথা কেউ আর বড় একটা তোলে না। স্বামী এখনও সাইবেরিয়ায় যুদ্ধবন্দী -- একথা কাউকে বলতে রিও আজকাল বড় বিব্রত বোধ করে।

'কি আশ্চর্য! আমিও সাইবেরিয়ায় ছিলাম। সেখানে তিন বছর গাছ কাটার কাজ করেছি। ফিরে এসেছি সবে গতবছর, তাও বহু কাঠখড় পুড়িয়ে। আসলে সবই কপাল! আপনার স্বামীর কণ্ঠটা বুঝি। তবে আপনার কণ্ঠও কিছু কম না।' পুরুষটি বলে।

-- 'আপনি সাইবেরিয়া ফেরত? চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায়না!'

-- 'তা বটে। বেঁচে তো আছি দিবি।' পুরুষটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দেয়।

খাওয়া শেষ করে টিফিন বাক্স ব্যাগে ভরতে ভরতে রিও ভাবে এ লোকটার কথাবার্তা বেশ সহজ সরল আর খোলামেলা। হয়তো সেজন্যেই নিজেও সে আড়ষ্টতা কাটিয়ে অনেক গল্প করে

ফেললো। সাধারণত বেশী শিক্ষিত আর অপরিচিত লোকের সামনে এতটা সহজ সে হতে পারেনা।

-- 'ছেলেপুলে আছে?'

-- 'একটা ছেলে। ছ' বছর বয়েস। এতদিনে স্কুলে ভর্তি করানো উচিত ছিল, কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি।'

পুরুষটি মাথা থেকে রুমালটা খুলে, তা দিয়েই কাপ দুটো পুঁছে নেয়। তারপর গরম চা ঢেলে একটা কাপ রিওর হাতে দিয়ে, নিজে আরেকটাতে চুমুক দেয় শব্দ কোরে, 'বাঃ, চমৎকার!'

-- 'ভাল লাগছে? এর পাতা অবশ্য খুব ভাল জাতের না। পাইকারি বাজারের এক কিলোগ্রাম দু'শ দশ ইয়েনে বিক্রি হয়। তবে খেতে খারাপ লাগে না।'

বাতাসের তেজ বেড়েছে, টিনের ছাদে শব্দ থেকেই টের পাওয়া যায়। রিও একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। এই ঠাণ্ডায় এতটা পথ হাটতে হবে, ভেবেই কেমন কুকুড়ে যায় সে।

-- 'আমি এক প্যাকেট চা কিনবো' পকেট থেকে দোমড়ানো দুটো কাগজের নোট বার করতে করতে বলে পুরুষটি।

-- 'না না, পয়সা বার করবেন না। আমি আপনাকে এমনিই দিচ্ছি।'

-- 'কক্ষনো না। এটা আপনার ব্যবসা।' রিওর হাতে জোর করে টাকা গুঁজে দিতে দিতে বলে পুরুষটি। 'আবার কখনও এ তল্লাটে আসলে টু মারবেন, গল্পসল্প করা যাবে।'

-- 'আচ্ছা। কিন্তু আপনি কি সবসময় এখানে থাকেন?'

-- 'ওই লোহার স্তূপ পাহারা দেওয়া, ওগুলো ট্রাকে তোলা -- এটাই আমার কাজ। তাই বেশীর ভাগ সময় এখানেই থাকি।' তারের নীচে আলমারির দরজা খুলে পুরুষটি দেখায় সেখানে একটা বিছানা গুটিয়ে রাখা আছে। দরজার পিছনে সাঁটা একজন চিত্রাভিনেত্রীর রঙ্গীন ছবি রিওর চোখ এড়ায় না। 'লোকটার বয়েস কত?' অনুমান করার চেষ্টা করে সে।

২

সেই দিনের পর থেকে রিও চা পাতা বিক্রি করার জন্য নিয়মিত শিতামাচি এলাকায় যেতে শুরু করে, আর প্রতিবার গুমটিঘরেও টু মারে। রিও জেনেছে পুরুষটির নাম এসুরুইশি ইওশিও। ফেরার সময় রিওর টিফিন বাক্সে কোনও না কোনও সুখাদ্য এসুরুইশি ভরে দেবেই, তা সে এক টুকরো গোমাংসই হোক, বা সার্ডিন মাছ, কিম্বা প্লামের আচার। ওই এলাকায় রিওর কয়েকজন বাঁধা খদ্দের যোগাড় হয়েছে, বিক্রিও আগের চেয়ে বেড়েছে।

প্রথম সাক্ষাতের সপ্তাহখানেক পর পুত্র রিউকিচিকে নিয়ে এসুরুইশির সাথে দেখা করতে যায় রিও। এসুরুইশি বালকটির সাথে গল্পে মেতে ওঠে। তারপর ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে কিনে আনে বড়সর একখানা ক্যারামেল কেক। 'ছেলেটা খেতেটেতে ভালইবাসে', রিউকিচির কদম ছাঁট চুলে হাত বুলিয়ে স্নেহচ্ছলে মন্তব্য করে এসুরুইশি।

রিও মনে মনে ভাবে তার নতুন বন্ধু কি বিবাহিত! সত্যি বলতে কি এসুরুইশির জীবনের নানান দিকের কথাই জানতে ইচ্ছা করে। রিও উনত্রিশ বছরের জীবনে এই প্রথম স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষ সম্বন্ধে আগ্রহ বোধ করছে। এসুরুইশির সহজ সরল নিরুদ্বেগ স্বভাব - এটাই বোধহয় রিওকে আকৃষ্ট করেছে সবচেয়ে

বেশী। তবে সে চায় না ঐসুরুইশি এখনই তা টের পেয়ে যাক।

কিছু দিন কাটতে না কাটতেই ঐসুরুইশি প্রস্তাব দিল --তিনজনে মিলে আসাকুসা বেড়াতে গেলে কেমন হয়? এরপর একটা ছুটির দিনে উয়েনো স্টেশনে যখন তাদের দেখা হোল, তখন ঐসুরুইশির পরণে ছাই রঙা পুরোনো সুটু যা কষ্ট কোরে গায়ে আঁটাতে হয়েছে, রিওর পরণে নীল স্কার্ট আর হাক্কা বাদামী রঙের কোট। সাদামাটা সস্তা পোশাক সত্ত্বেও প্রাণপ্রাচুর্য আর লাভণ্যে ভরপুর রিওকে ভিড়ের মধ্যেও চট করে চোখে পড়ে। একটু ভারী চেহারার দীর্ঘদেহী ঐসুরুইশির পাশে রিওকে দেখায় বেড়াতে বেরোনোর আনন্দে উগ্গমগ করা স্কুলের ছাত্রীর মতো। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে সে গুছিয়ে নিয়ে এসেছে রুটি, কমলালেবু আর শুকনো সামুদ্রিক শৈবাল জড়ানো ভাত -- দুপুরে খাওয়ার জন্য।

--'বৃষ্টি না পড়লেই হয়।' রিওর কোমরে আলতো হাত রেখে ভিড়ের মধ্যে পথ করে এগিয়ে যেতে যেতে বলে ঐসুরুইশি। আসাকুসা স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনে, তারপর মাৎসুইয়া ডিপার্টমেন্ট স্টোরের সামনে অগুনতি ছোট ছোট দোকান পার হয়ে নিতেন শিশু গোট। জায়গাটা রিও যা ভেবেছিল তার থেকে অনেকটাই অন্যরকম। লাল ল্যাকারের একটা ছোট মন্দির দেখে ঐসুরুইশি চিনিয়ে দেয় এটাই আসাকুসার বিখ্যাত খান্নো মন্দির। দূর থেকে ভেসে আসা ট্রান্সপেট আর স্যাক্সোফোনের সুরের সাথে প্রাচীন সাসাকি গাছের ডালপালায় বাতাসের বিবরণ শব্দের একতানে এক অদ্ভুত মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রিও একরাশ বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে সবকিছু দেখতে থাকে।

পুরোনো জামা-কাপড়ের বাজার ছাড়িয়ে আসাকুসা হ্রদ। পাশেই গায়ে গায়ে লাগানো খাবারের দোকান। ঐসুরুইশি একমুঠো লজেন্স কিনে রিউকিচির হাতে দেয়। সামনের সরু রাস্তাটা হোটেল, রেস্তোরাঁ আর সিনেমার আমেরিকান ধাঁচের অসংখ্য বিজ্ঞাপনে ভর্তি। হাঁটতে হাঁটতে রিও ভাবে, এক মাসও হয়নি ঐসুরুইশির সাথে পরিচয়, অথচ মনে হচ্ছে না জানি কত কালের চেনা।

-- 'এই রে! বৃষ্টি শুরু হল।' ঐসুরুইশি হাত পেতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ধরার চেষ্টা করে। রিও মুখ তুলে তাকায় ধূসর আকাশের দিকে। বেড়ানোটা বুঝি মাটি হোল, ভেবে মন খারাপ হয়ে যায়।

-- 'ওই দোকানটায় ঢোকা যাক', ঐসুরুইশির পিছন পিছন মেরী টি হাউস নামের একটি চায়ের দোকানে গিয়ে বসে রিও আর রিউকিচি। দোকানের সিলিং থেকে প্লাস্টিকের চেঁরী ফুল ঝুলছে। খুব যে একটা রুচিসম্মত জায়গা, তা না। তবু ওরা যতটা সম্ভব ভালভাবে সময় কাটানোর চেষ্টায় এক কেটলি চা অর্ডার করে, সঙ্গে নিয়ে আসা দুপুরের খাবার ভাগাভাগি করে খেয়ে নেয়। খাওয়া শেষ হতে না হতেই বৃষ্টি শুরু হোল মুগলধারায়।

--'একটু না কমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। এখনই বাড়ী ফেরা যাবে না।' রিও ভাবে কার বাড়ীর কথা বলছে ঐসুরুইশি -- নিজের, না রিওর? রিওর এখন আন্তানো বলতে এক বন্ধুর বাড়ী, যেখানে তার নিজস্ব ঘর বলে কিছু নেই। সেই বাড়ীতে যাওয়ার চেয়ে বরং ঐসুরুইশির গুমটিঘরে যাওয়া ভাল। কিন্তু সেখানেই বা তিনজন আঁটবে কি করে! মানিব্যাগে কত পয়সা আছে লুকিয়ে গুণে দেখলো টেবিলের তলায় নিয়ে গিয়ে। সাতশো ইয়েন -- তিন জনের কোনও হোটলে গিয়ে কয়েক ঘন্টা কাটানোর পক্ষে যথেষ্ট!

-- 'একটা সিনেমায় গেলে কেমন হয়? তারপর কোথাও খেয়ে রাত্রে বাড়ী ফিরবো। খুব কি খরচের ব্যাপার?'

-- 'কিছুটা তো বটেই।' বলে হাসতে থাকে ঐসুরুইশি। 'তবে হচ্ছে যখন হয়েছে, যাওয়া যাক।'

মেরী টি হাউসের কাছেই একটা সিনেমা হল। ঐসুরুইশি নিজের কোট দিয়ে রিউকিচিকে আপাদমস্তক মুড়িয়ে নেয়। তারপর ওর হাত ধরে ছুট লাগায় সিনেমা হল লক্ষ্য করে। পিছন পিছন রিও। হল দর্শকে পুরোপুরি ঠাসা। বসার জায়গা একটাও খালি নেই। সারাদিনের যোরাঘুরিতে ক্লান্ত রিউকিচি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমাতে থাকে ঐসুরুইশির গায়ে ঠেস দিয়ে। ছাদে বৃষ্টির শব্দ, ভেতরে গুমোট গরম।

হল থেকে ওরা বেরোয় যখন, প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই, তার ওপর পাগলা বাতাস। তিনজন কোনও রকমে গিয়ে ওঠে একটা ছোট সরাইখানায়। সরাইখানার মালিক তাদের সরু করিডোরের শেষ প্রান্তে একটা কার্পেট মোড়া ঘরে নিয়ে যায়। রিউকিচি একটু বসতে পেরেই আবার ঢলে পড়ে ঘুমে। চেয়ার থেকে একটা কুশন তুলে এনে ঐসুরুইশি ওর মাথার তলায় দিয়ে দেয়।

বৃষ্টি পড়ছে আকাশ ভেঙে। জানালার পাশে রেইন ওয়াটার পাইপ দিয়ে ঝর ঝর শব্দে বৃষ্টির জল উঠান ভাসিয়ে দিচ্ছে। কান পেতে শুনলে মনে হয় দূরে কোনও পাহাড়ী গ্রামে বারনার শব্দ।

ঐসুরুইশি পকেট থেকে রুমাল বার করে রিওর ভিজে চুল মুছিয়ে দেয়। রিও একটু অবাক হয় বটে, কিন্তু মন ভরে ওঠে এক সুখানুভূতিতে। এই বৃষ্টি যেন ওর নিঃসঙ্গতা ধুয়ে দিচ্ছে।

'কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার।' রিও ঘর থেকে বেরিয়ে এক পরিচারিকাকে দেখতে পেয়ে দু প্লেট স্পাগেটি অর্ডার করে। ফিরে এসে লোহার উনুনে জ্বালিয়ে রাখা আগুনের কাছে বসে এক কাপ সবুজ চা নিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে থাকে। উল্টো দিকে ঐসুরুইশি। হঠাৎ ঐসুরুইশি কি মনে করে উঠে এসে বসে রিওর পাশে, প্রায় গা ঘেঁসে। ওদের পিছনে দেওয়াল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে দুজনেই কেমন আনমনা হয়ে যায়।

-- 'রিও, তোমার বয়েস কত? দেখে মনে হয় পাঁচিশের বেশী না।'

হেসে ওঠে রিও, 'ভুল করছো ঐসুরু। আমার এখন উনত্রিশ। বুড়ি হয়ে গেলাম।'

-- 'তার মানে তুমি আমার চেয়ে এক বছরের বড়।'

-- 'সে কি! আমি তো ভেবেছিলাম তোমার বয়েস অন্তত ত্রিশ।' রিও ঐসুরুইশির চোখে চোখ রাখে। ঘন ভুরু তলায় শান্ত গভীর দুটি চোখ। ঐসুরুইশি যেন একটু লজ্জা পেয়ে পায়ের ভিজে মোজা খুলে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বৃষ্টির বিরাম নেই। ওদিকে পরিচারিকা দু প্লেট ঠাণ্ডা স্পাগেটি আর সুপ নিয়ে হাজির। রিও ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে খেতে বসায়। ঢুলতে ঢুলতে রিউকিচি খাবার মুখে দেয়। খাওয়া সারে রিও আর ঐসুরুইশিও।

-- 'আজ রাতটুকু এখানে থেকে গেলে হোত। এই দূর্যোগে বাড়ী ফেরা সম্ভব?'

-- 'মনে হয় না।' রিও উত্তর দিতে না দিতেই ঐসুরুইশি গিয়ে সরাইখানার কর্মীদের কাছ থেকে লেপ তোশক সমেত পুরো বিছানা নিয়ে এসে মেঝের ওপর পেতে দেয়। ঘর জুড়ে বিছানা। রিও ছেলেকে শুইয়ে নিজেও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে অন্য একটা বিছানায়। ঐসুরুইশি নিজের বিছানাটা পেতেছে ঘরের আরেক কোনায়। 'মনে হয় এখানকার লোকেরা আমাদের স্বামী-স্ত্রী

ভাবছে।' একটু পরে মন্তব্য করে সে।

'হুম্, হয়তো তাই। ওদের ভুল ভাঙিয়ে না দেওয়াটা কি অন্যায় হচ্ছে?' ঠাট্টাচ্ছিলে উত্তর দিলেও রিওর অন্তরে কোথায় যেন অস্বস্তি আর অপরাধবোধ খোঁচা দেয়। মনের পর্দায় উঁকি মারে স্বামীর মুখ। তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে স্মরণ করায়, বৃষ্টিতে নিরুপায় হয়েই তারা সরাইখানায় মাথা গুঁজতে বাধ্য হয়েছে। তারপর এটা সেটা ভাবতে ভাবতে কখন যেন রিওর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে।

ঘুম ভেঙে যায় ঐসুরুইশির কণ্ঠস্বরে। বাইরে তখনও অন্ধকার। রিও শুনতে পায় গলা নামিয়ে তাকেই ডাকছে ঐসুরুইশি। 'রিও, রিও, আমি কি তোমার কাছে গিয়ে একটু কথা বলতে পারি?'

-- 'না, না, সেটা উচিত হবে না।' হাওয়ার তেজ অনেকটা কমে এলেও ছাদে বৃষ্টি পড়ার শব্দ এখনও হচ্ছে।

তারই মধ্যে ঐসুরুইশিকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনলো রিও।

-- 'ঐসুরু, তুমি বিয়ে করেছো?'

-- 'হুঁ, করেছিলাম, তবে এখন আমি একা। যুদ্ধের পর দেশে ফিরে দেখি বৌ আমার অন্য লোকের সাথে ঘরকন্মা করছে।'

-- 'তোমার রাগ হয়নি?'

-- 'রাগ? হয়েছিল, তবে তাতে আর কি লাভ।' এরপর দুজনেই নীরব। কিছুক্ষণ পর রিও জিজ্ঞেস করে,

'তখন কি বলতে চেয়েছিলে?'

-- 'বিশেষ কিছু না।' হাসলো ঐসুরুইশি, 'আচ্ছা, স্পাগেটিটা কেমন লেগেছে?'

-- 'ভাল না। অথচ কতগুলো পরিসা নিল।'

-- 'রিউকিচিকে নিয়ে তোমার একটা আলাদা বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা হলে বেশ হোত, তাই না?'

-- 'তা তো হোতই। আচ্ছা ঐসুরু, তোমার বাড়ীর কাছে ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে না?'

-- 'এখন শিতামাচিতে ঘর পাওয়া খুব কঠিন। তবে খোঁজ রাখবো। পেলেই জানাবো। তুমি বড় ভাল রিও।'

-- 'আমি? বল কি?' হাসতে হাসতে রিও গড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ তার ইচ্ছা করে ঐসুরুইশিকে জড়িয়ে ধরতে। ভোরবেলায় দোকানে দোকানে জিনিস পোঁছে দেওয়ার একটা গাড়ী ঠিক ওই সময় হুশ্ কোরে চলে যায় জানালার পাশ দিয়ে।

-- 'ঐসুরু, তোমার বাবা মা কোথায় থাকেন?'

-- 'ফুকুওকার একটা গ্রামে।'

-- 'বোন টোকিয়ো-তে?'

-- 'হ্যাঁ। বেচারি একা হাতে সংসার চালায় তোমারই মতো। দুটো বাচ্চা। নিজে হাতে পোশাক সেলাই করে বিক্রি করে। স্বামী কয়েক বছর আগে যুদ্ধে মারা গেছে। এই যুদ্ধটাই সব গোলমাল করে দিল।'

রিও দেখে পূব আকাশে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। দুজনের একসাথে কাটানোর সময় তাহলে ফুরিয়ে এলো? রিও-র বুকটা মুচড়ে ওঠে। বিবেকের ভুকুটি সত্ত্বেও মনে মনে ভাবে, কাছে এসে বসতে বারণ করেছি বলেই কি তা শুনতে হবে?

উল্টো দিক থেকে আবার ঐসুরুইশির গলা, 'ঘুম আসছে না। এভাবে শোয়ার তো অভ্যেস নেই।'

-- 'এভাবে মানে?'

-- 'কোনও মেয়ের সাথে একই ঘরে।'

-- 'কেন? তোমার বুঝি মেয়ে বন্ধু নেই?'

রিও টের পায় ঐসুরুইশি উঠে এসেছে। দীর্ঘদেহী মানুষটার বলিষ্ঠ দুটি বাহু তাকে টেনে নিচ্ছে চওড়া বুকের মধ্যে। এরপর, একাকীত্বে হাঁপিয়ে ওঠা দুটি প্রাণের মিলনাবেগের জোয়ারে ভেসে যায় সব ন্যায়-অন্যায় বোধ।

৩

দু দিন পর রিও ছেলেকে নিয়ে খুশীতে ভাসতে ভাসতে হাজির হয় ঐসুরুইশির গুমটিঘরে। কিন্তু গুমটির সামনে মাথায়



লাল রুমালের ফেড়ি বাঁধা প্লাষ্টিকের এপ্রোন পরা মানুষটাকে দেখতে না পেয়ে অবাক হয় একটু। রিউকিচি হাত ছাড়িয়ে ছুটে ভিতরে গিয়ে দেখে এসে মা-কে জানায় অন্য লোকেরা বসে আছে। চিন্তিত রিও তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ঢুকে পড়ে।

-- 'কাকে চাই?'

-- 'ঐসুরুইশি কোথায় গেলেন?'

-- 'আপনি জানেন না? ও তো কাল মারা গেছে।' অল্পক্ষণ চপ করে থেকে উত্তর দেয় অপরিচিতদের একজন। 'গতকাল রাত আটটা নাগাদ। লোহা বোঝাই ট্রাক নিয়ে ওমিয়ায় গেছিল। ফেরার পথে একটা সরু ব্রীজের ওপর ট্রাকটা উল্টে যায়। ড্রাইভারও বাঁচেনি। ঐসুরুইশির বোন গেছে ওমিয়ায় ওর শেষ কাজ করতে।'

রিও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এসব কি শুনছে সে! এগুলো কি সত্যি? তাকের ওপর ঠাকুরের আসনে জ্বলছে একটা মোমবাতি। অপরিচিত দুজন মিলে একটা বাস্কে ঐসুরুইশির জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলছে। রিওর চোখে পড়লো ঠাকুরের আসনের পাশে তারই দেওয়া একটা চায়ের প্যাকেট।

-- 'আপনি বুঝি ঐসুরুইশির বন্ধু? বড় ভাল ছিল লোকটা। আশ্চর্য! কাল ওর ওমিয়া যাওয়ার কোনও কথাই ছিল না। ড্রাইভারের হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় শেষ মুহুর্তে ও সঙ্গে গেল মাল নামানোয় সাহায্য করবে বলে। একেই বলে নিয়তি। প্রথমে যুদ্ধ, তারপর সাইবেরিয়া থেকে বেঁচে ফিরে শেষকালে কিনা এই ভাবে মারা গেল!'

রিওর যেন বোধশক্তি লোপ পেয়েছে। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে দেখছে মেঝের ওপর জড়ো করা ঐসুরুইশির জিনিসপত্র -- কেটলি, ফ্রাইং প্যান, রবারের জুতো, আরও কত কিছু। আলমারির দরজার পিছনে লাগানো চিত্রাভিনেত্রীর রঙিন ছবিখানা

খুলে নিয়ে ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝাড়ছে একজন। ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে চোখ পড়তে দেখে লাল চক দিয়ে তাড়াহুড়ো করে লেখা --রিও , দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। ফিরবো রাতেই।

রিও যন্ত্রচালিতের মতো ছেলের হাত ধরে গুন্টঘর থেকে বেরিয়ে হন্ হন্ করে হাঁটতে শুরু করে। দু চোখে অশ্রুর বন্যা।

--‘মা , ও মরে গেছে ?’

--‘হ্যাঁ !’

--‘কেন মরে গেল ?’

--‘নদীতে পড়ে গেছিল।’

রিওর চোখেও নদীর প্লাবন। হাঁটতে হাঁটতে সুমিদা নদীর ওপর সেতু পার হয়ে হাকুহো-র দিকে এগোতে থাকে।

--‘আবার যদি মা হও , চিন্তার কিছু নেই। আমি দেখবো তোমাদের। আমার বেতন বেশী না , তবু মাসে হাজার দুয়েক ইয়েন দিলে যদি তোমার কষ্ট একটু কমে , তাই করবো।’ সেদিন সকালে আসাকুসা থেকে বাড়ী ফেরার সময় রিওকে বলেছিল ঙসুরুইশি। রিউকিচিকে কিনে দিয়েছিল নতুন বেসবলের ক্যাপ। স্টল থেকে বড় বড় গ্লাস ভর্তি দুধ কিনে খাইয়েছিল। তার পর রাস্তায় বৃষ্টির জমা জল পা দিয়ে ছিটিয়ে মজা করতে করতে যে যার বাড়ী ফিরে গিয়েছিল।

নদীর ধার ঘেঁসে হাঁটতে হাঁটতে রিও-র মনে হয় বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর বুঝি জমে যাচ্ছে। ওপারে কতগুলো পাখি -- ওরাও যেন জমে গেল। জলের বুকে কয়েকটা নৌকো -- হেলেদুলে চলেছে গন্তব্যে।

--‘মা, আমাকে একটা ছবি আঁকার খাতা কিনে দেবে ?’

--‘এখন না , পরে।’

--‘ক্ষিধে পেয়েছে। কিছু কিনে দাওনা।’

--‘পরে , একটু পরে।’

সামনে লম্বা ব্যারাকের মতো দেখতে একটা বাড়ী। রিও আচ্ছন্ন মনে ভাবে , এখানে নিশ্চয়ই অনেক লোক -- আলাদা আলাদা ঘর নিয়ে আছে। একটা ঘরের জানালায় তোশক রোদে দেওয়া হয়েছে। ভেতরে একজন মহিলা ঘর গোছাচ্ছেন।

--‘ চা নেবেন ? শিয়ুওকার ভাল চা ? ’ উত্তর না পেয়ে রিও আরেকটু জোর গলায় কথাগুলো বলতেই মহিলা ঝাঁঝিয়ে উঠে দরাম্ করে মুখের ওপর জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। রিও এক এক করে সব ঘরের সামনে যাচ্ছে আর প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। পিছন পিছন ক্লাস্তি আর ক্ষিধেতে রিউকিচির একটানা ঘ্যানঘ্যান। ভারী ব্যাগের ফিতে বসে গিয়ে কাঁধটা ভীষণ জ্বালা করছে রিওর। তবু কেন জানি এই মুহুর্তে ও শারীরিক যন্ত্রণাটাই চাইছে বেশী করে।

8

পরদিন রিও একা আবার যায় শিতামাচিতে। গুন্টঘরের কাছে পৌঁছে লক্ষ্য করে ভিতরে উনুনে আগুন জ্বলছে। দৌড়ে

দরজা ঠেলে ঢুকে দেখে একজন বয়স্ক লোক প্লাস্টিকের ছোট এপ্রোন পরে উনুনের সামনে বসে আগুনে কাঠ গুঁজে দিচ্ছেন। ছোট ঘরটা ভরে উঠেছে ধোঁয়ায়।

--‘কি চাই ?’

--‘শিয়ুওকার চা আছে , নেবেন ?’

-- ‘শিয়ুওকার চা ? আমার এখানে তো ভাল চা অনেক আছে। আর দরকার নেই।’

রিও তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসে। ভেবেছিল ঙসুরুইশির ছবিতে ধূপ দিতে যাওয়ার জন্য বোনের ঠিকানাটা জানবে। এখন সেই হচ্ছেটাও নেই। অবসন্ন মন আর ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে রিও ফিরে যায় আবার নদীর ধারে। ভাঙা কংক্রিটের একটা স্তূপ দেখতে পেয়ে বসে পড়ে তারই ওপর। জলে পড়ন্ত রোদের আলো। সেদিকে তাকিয়ে রিও ভাবে , ‘ঙসুরুর সাথে দেখা না হলেই ভাল হোত।’

সত্যিই কি তাই ? এটাই কি রিওর অন্তরের কথা ? ‘না , না , মাথা নেড়ে নিজের কথাই খণ্ডন করে রিও , ‘কক্ষনো না। ঙসুরুর সাথে বন্ধুত্ব করা , সেই সম্পর্ক আরও অন্তর্দগ্ন করে তোলা , এসবের জন্য কোনও অনুতাপ বা গ্লানি আমার নেই। দেশের বাড়ী ছেড়ে টোকিয়োতে চলে আসা ভুল হয়েছে বলেও মনে করি না।’ রিও ঙসুরুইশিকে হারানোর দুঃখের মধ্যে থেকেই নতুন করে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি খুঁজে নিচ্ছে। এই সেই রিও যে অল্পদিন আগেও ভেবেছিল ব্যবসা ভাল না চললে ফিরে যাবে দেশের বাড়ী। কিন্তু এখন সে মনস্থির করেছে টোকিয়ো ছেড়ে কোথাও যাবে না। শুধু তাই নয় , থাকবে এই শিতামাচিতেই , ঙসুরুইশি যেখানে থাকতো।

রিও উঠে দাঁড়ায়। চটপট চায়ের ব্যাগখানা পিঠে ফেলে জোর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীর তীর থেকে দূরে একটা সফ্র রাস্তায় গিয়ে পৌঁছায়। রাস্তার প্রান্তে জরাজীর্ণ ছোট একটা বাড়ী , যার সামনের দেওয়ালে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন কাঁচা হাতে পেরেক দিয়ে আটকানো। রিও দরজার সামনে গিয়ে হাঁক পাড়ে , ‘চা নেবেন , চা। ভালো চা আছে।’

দরজাটা খুলে যায়। রিও দেখে তার চেয়েও মামুলি পোশাক পরিহিতা এক মহিলা দাঁড়িয়ে। রিও-র পিঠে ভারী ব্যাগটা লক্ষ্য করে মহিলাটি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে , ‘আসুন , ভেতরে এসে বসুন। দেখি , বাড়তি কিছু পয়সা খুঁজেপেতে পাই কি না। তাহলে একটু চা তো কেনাই যাবে।’

রিও ভেতরে ঢুকে ব্যাগ নামিয়ে , নিজেও বসে। ঘরখানা খুব ছোট। তারই মধ্যে চারজন মহিলা একটা তেলের স্টোভের কাছাকাছি বসে একনাগাড়ে শার্ট আর মোজা সেলাই করে চলেছে। এদের ব্যস্ত হাতের কাজ দেখতে দেখতে রিও ভাবে , ‘এরা সবাই আমারই মতো।’ উষ্ণতার পরশ লাগে রিওর মনে।

(শিতামাচি -- DOWNTOWN)

২

অনাবাসীর আবাসপ্রাপ্তি ও আনুষঙ্গিক উপসর্গ

শংকর বসু

হোকোকোহামা ছাড়ার মাসখানেক আগেই বুঝেছিলাম এ দূর্ভোগ কপালে আছে। অধিকাংশ অসুখ না জানিয়েই থাবা মারে সস্তপনে -- প্রস্তুতির লেশমাত্র অবকাশ না দিয়েই। কিন্তু এই প্রসারিত প্রবাস কাতরতা অনেক আগে থেকেই উপসর্গের মালা পরিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মিছিল করেছিল আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে। তা সত্ত্বেও ঐ অনাবাসের সাচ্ছন্দ্য ছেড়ে আবাসপ্রাপ্তির প্রয়াস খানিকটা স্বখাতসলিলে অবগাহন বলা চলে। পরিচিত এবং হিতৈষীদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে ঐ কর্মময় জীবন থেকে এই কর্মনাশা নগরীতে ফেরা দুর্লক্ষণ সন্দেহ নেই -- কিন্তু শিকড়ের টান রোধে কার সাধ্য। সে যাইহোক, পারিভাষিক কথার ধোঁয়াশা ছেড়ে চলে যাই আবাসপ্রাপ্তি ও আনুষঙ্গিক উপসর্গের ব্যঞ্জনা।

ফুজিমোতো সানের সঙ্গে দেখা হল তোবে স্টেশনের কাছে ছোট এক পানশালায়। বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে আড়চোখের ইশারা করলেন পানীয়ের সঙ্গ দিতে। ইংরেজীটা বেশ পরিষ্কার বলেন দেখে এবং বেশ খানিকটা গল্পের সম্ভাবনা আছে এই লোভে বসে গেলাম। কথায় কথায় জানা গেল এই মানুষটির কর্মময় জীবনের ব্যাপ্তি। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা ঘুরে জীবনের একটা বিশেষ সময় কাটিয়েছেন পশ্চিম আফ্রিকায়। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে অনুভব করেন নি কোনও অনাবাস কাতরতা -- স্ত্রী পুত্র, আত্মীয়স্বজন, কেউই বাধা হয় নি সেই কর্মময় জীবনের ম্যারাথন দৌড়ে। কর্মজীবনের আনুষ্ঠানিক বিদায়পর্বে স্বদেশের টান প্রথম অনুভব করেন এই মানুষটি এবং খানিকটা রোমান্টিক আবেগে সাজিয়ে ফেলেন ভবিষ্যত অবসর জীবনের স্বপ্নগুলি। কিন্তু সেই যে তিনি চাইলেন ভিতর পানে -- তাঁর পরিচিত জগত তখন হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করছে পশ্চিমকে, কোন এক সামাজিক কেন্দ্রাতিক বলে। একরাশ মানুষের ভিড়ে মানুষটা হয়ে গেলেন সম্পূর্ণ একা। দিনের একটা বড় সময় কেটে যায় এই পানশালায়, নতুন সঙ্গীর সন্ধান। পানীয় শেষ করে ওভারকোটের ভাঁজ খুলতে খুলতে অস্ফুট স্বরে যেন বলে উঠলেন 'দেবী করে ফেলেছিলাম'।

আমার ও আমার পরিবারের দু বছর জাপান-যাপন কোনও অর্থেই যন্ত্রণাক্রান্ত নয়। বরং এই পরবাস সাহচর্যে আর অভিনবত্বে আপাত প্রগতিশীল ভারতীয় মোহ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্তি দিয়েছে। যে ছন্দ কৃষ্টির আলোয়ান গায়ে আমরা এই শুকনো ডাঙ্গায় আছাড় খেয়ে চলেছি -- তার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে কর্মযোগের এই অভিনব চড়াই-উৎরাই জীবনের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে বললে বাড়াবাড়ি হবে না। কোথা থেকে এলাম এবং কোথায় চলেছি, তার সুস্পষ্ট একটা ধারণা থাকায়, অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতের একটা নিরাসক্ত নিশ্চিত ঠিকানা থাকায় এই দু বছর একটা ঝকঝকে নিটোল বর্তমান উপহার দিয়েছে। তাই কাওয়াগুচি হৃদের বুকে দাঁড়িয়ে সে যখন বলে 'তিলোকুমা ফুজিয়ামা' -- তখন মনে মনে একাত্ম হয়ে সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছে। সেই বর্তমানের প্রেক্ষাপটে আকিতার ধানক্ষেত মিশে গেছে আউশ গ্রামে, হাকোদাতের পথ

চলে গিয়েছে নিশ্চিতপুরে। তাই সেই বর্তমান যারা বসাতে পারেনি অনাবাসের অনিশ্চয়তায় বা আবাসপ্রাপ্তির স্মৃতিকাতরতায় --- এ এক অনন্য সাধারণ উপলব্ধি যা শরীর ও মনের প্রত্যেকটি শূন্যস্থান ভরাট করে দিয়েছে।

কোলকাতায় পা রেখে অনুভব করলাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জড়তার ক্লাস্তি, বাতাসে বাষ্প জমার শব্দ। সময় এখনো এখানে বন্দী রাজনীতির অন্ধ কুঁয়োর গভীরে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্বকীয় অহমিকায় এই শহর এবং তার অন্তরে লুকিয়ে রাখা সমাজ পিছোতে পিছোতে একেবারে এসে ঠেকেছে সমুদ্রের কিনারায়। তাই বোধহয় চন্দ্রায়ণ নয়, সংসদীয় নির্বাচন জাতীয় উৎসবের স্থান করে নিয়েছে। সাংস্কৃতিক রাজধানীর আসল রূপটি আসলে কি, তা নিয়ে নানারকম বিতর্ক আছে। সেদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ভবেশদার সঙ্গে। ভবেশদা বহু বছর ধরে ছোট বড় সকলের জন্য পপুলার সায়েন্স বিষয়ক বই লিখে এসেছেন। এখন আর সেই মানুষ ওই সব লেখেন না, কারণ কোলকাতায় বোধহয় ওইসব পড়ার পাঠক হারিয়েই গেছে। হয়তো মিষ্টি উপন্যাস বা কবিতা লিখবেন লেখার অভ্যেসটা রাখবার জন্য। সে বই হয়তো লোকে কিনবে, তবে পড়বে কিনা সে গ্যারান্টি দেওয়া অসম্ভব। স্পষ্টতই বেশ হতাশ দেখলাম সৃষ্টিশীল উৎসাহী এই মানুষটিকে। তাই প্র্যাস্টিকের ফুল থেকে কৃষ্টিপ্রিয়তার মূল্যায়ন করতে এখন বেশ ভয়ই লাগে। অথচ প্রত্যেক ভদ্র বাঙালীর বসার ঘরে ফুলদানী এবং বইয়ের আলমারী বেশ সুন্দর করে উপযুক্ত রুচি সহযোগে সাজান থাকে।

পরিবর্তন যে হয় নি, তা কিন্তু নয় -- সুউচ্চ শপিং মলের বাঁচক্চকে দোকান ঘরের বৈভব রীতিমত বিকল করে প্রবাসী বাঙালীদেরও। অথচ ঠিক তার বাইরে রাস্তায় রাস্তায় অগুনতি গাড়ীর ভিড়, ধোঁয়া, শব্দ আর আবর্জনা মনে করিয়ে দেয় সেই পুরোনো শ্লোগান -- বড়লোকের মল আর গরীবের মুত্র এই হল কোলকাতার উন্নয়ন সূত্র। সত্যিই এমন শান্তিপূর্ণ সহবস্থান বড় একটা দেখা যায় না। আর এই দ্বন্দ, সংশয় আর দিশাহীনগ্রস্ত হয়ে দিক্শূন্যপুর আমার শহর।

আকিমোতো সান ও তাঁর স্ত্রী তোমোকো সান তাঁদের তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে জমিয়ে সংসার করছেন কোলকাতার উপকণ্ঠে। এক রবিবার ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে গেলাম তাঁদের দোরগোড়ায়। মুগের ডাল ভাত আর আলুভাজা মুখে দিয়ে তিন বছরের আও-চানের ফোকলা হাসি মনে করিয়ে দিল আমার পুত্রের জাপানী লাঞ্চার সুখস্মৃতি। অনাবাসের যন্ত্রণা এখানেও হার মেনেছে। দেশের স্মৃতিচারণায় উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য থাকলেও পরবাসের মাধুর্যও যে পরম উপভোগ্য হতে পারে, এ কথা আবার অনুভব করলাম এই জাপানী পরিবারের সান্নিধ্যে এসে। উঠোনের বাতাবি লেবু গাছের তলায় তাৎসুমি চান আর কো চানের ডাঙ্গুলি যুদ্ধ যখন তুমুল জমে উঠেছে, তখন এই উপলব্ধির রেশটুকু বুকে নিয়ে আবার পুনরুজ্জীবিত হলাম।

জাপানে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম দিকের অনুবাদক

শ্রী সাবুরো মাশিনোর জীবন-চিত্র

মাসাইয়ুকি উসুদা

এই ক্ষুদ্র লেখায় রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম দিকের একজন অনুবাদকের জীবন নিয়ে সামান্য আলোচনা করতে চাই। সেই অনুবাদকের নাম শ্রী সাবুরো মাশিনো (১৮৮৯ -১৯১৬), অবশ্য তিনি স্বয়ং একজন কবি ছিলেন। তাঁর ২৭ বছরের স্বল্প জীবনকালের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’, The Crescent Moon আর The Gardener ইংরেজী থেকে অনুবাদ করে মুদ্রিত করান তিনি।



অধিকাংশ আনাত্তী হাতে লেখা টিলেঢালা টুকরো রচনা ; তবে শুধু মাশিনোর অনুবাদটিতে যদিও শব্দ চয়নে ভারসাম্য রক্ষিত হয় নি , তবু টেগোরের প্রতি তাঁর আগ্রহ স্পষ্ট অনুভব করা যায়।’ (পৃ ৬৩০-৬৩১)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে কবি মাশিনোর অনুবাদটি ভাষার সঠিক ব্যবহারের দিক দিয়ে নির্দোষ না হলেও , রবীন্দ্রনাথের মূল কবিতার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও ভক্তি খাঁটি থাকায় পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

এই অনুবাদ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক রিউতারো আকুতাগাওয়া (১৮৯২-১৯২৭) মন্তব্য করেন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে লেখা চিঠিতে।

‘বড়ই দুঃখিত হলাম শ্রী মাশিনোর খবর পেয়ে। আমি ওঁর প্রতি সহানুভূতিশীল, কেননা ওঁর মনের ভাব আমি ভাল করে বুঝতে পারি। কিন্তু দুঃখের কথা , ওঁর গীতাঞ্জলির অনুবাদটা মোটেই ভাল হয়নি। অনুবাদের যেখানে সেখানে গুরুতর ভুল চোখে পড়ে। কাজটা বোধহয় তাড়াতাড়ি করতে হয়েছে। হয়তো সেই কারণেই ভুল হয়েছে।’

অনুবাদটি কি তাহলে একেবারেই বাজে ? তাইশো আমল (১৯১২-১৯২৬)-এর গোড়ায় অনুবাদ সাহিত্যের হাল কি রকম ছিল , সে সম্বন্ধে সুকবি - সুসমালোচক কৌনোসুকে হিনাৎসু (১৮৯০-১৯৭১) তাঁর ‘মেইজি তাইশো আমলের কাব্যের ইতিহাস’ নামক বইয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদ সম্বন্ধে সমালোচনা করেন। Yeats-এর ‘Ideas of Good and Evil’-এর অনুবাদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার পরে তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদ নিয়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন।

‘টেগোরের পরিচয়বাহী অনুবাদের মধ্যে আছে শোহেই হাইনো (১৮৮৭--১৯৩১) অনুদিত নির্বাচিত কবিতা (১৯১৪ সালে মিরাই (ভবিষ্যত) পত্রিকাতে প্রকাশিত) , সাবুরো মাশিনো অনুদিত গীতাঞ্জলি (১৯১৪) এবং The Crescent Moon ও Gardener (উভয় ১৯১৪ সালে) , সেকিজো মিউরা অনুদিত গীতাঞ্জলি (জাপানী নাম কাদা-নো সাসাগেমোনো)-র আক্ষরিক ভাষান্তর হচ্ছে ‘গাথাঞ্জলি’ (১৯১৫), রিওকুজিন হানাজোনো প্রণীত

‘টেগোরের পদ্য ও গদ্য’ (ইংরেজি-জাপানি দ্বিভাষিক যে সংস্করণ , তার উদ্দেশ্য হল ইংরেজি চর্চার সহায়ক হিসাবে বইটি ব্যবহার করা) (১৯১৫) , সেনসুই সাইকি রচিত ‘টেগোর ও কবীর’ (১৯১৬) , শিক্ষা-বিদ্যা গবেষণা চক্র সম্পাদিত ‘শ্রীশ্রী টেগোর’ (১৯১৬) আর জোনান কম্পানী সংকলিত ‘বিশিষ্ট লোকেরা টেগোরকে যেমন দেখেছেন’ (১৯১৬) প্রভৃতি। এই বইগুলির

তবে অনুবাদের কাজে ভাষার সঠিক প্রয়োগ অপরিহার্য। নিখুঁত অনুবাদ করার জন্য যথেষ্ট যত্ন সহকারে কাজটি করতে হয়। তাতে কোনোরকম তাড়াহুড়া করা চলে না। তাহলে কবি মাশিনো তাড়াহুড়া করলেন কেন ?

এ সম্পর্কে ঔপন্যাসিক আকুতাগাওয়ার বক্তব্য লক্ষণীয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কেন কবি মাশিনো তাড়াহুড়া করে অনুবাদ শেষ করতে বাধ্য হন। বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন।

আকুতাগাওয়া যাঁর উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলেন , তিনি আসলে কবি মাশিনোর মাসতুত দাদা। নাম তাঁর শ্রী কিওউ ইগাওয়া। তিনি পরবর্তীকালে প্রফেসর কিওউ এসুনেতো নামে পরিচিত হন এবং আইন-দর্শনের বিরাট পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। অনুমান করা হয় , তিনি তাঁর বন্ধু আকুতাগাওয়াকে জানিয়েছিলেন যে যক্ষ্মা রোগে শয্যাগত তাঁর মাসতুত ভাই মাশিনোর অবস্থা আশঙ্কাজনক। পরে আকুতাগাওয়া সাহিত্য অনুরাগী আরেক বন্ধুর মাধ্যমে কবি মাশিনোর মৃত্যু সংবাদ পান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে , তাঁদের সময়ে বহু যুবক -যুবতী যক্ষ্মা রোগে প্রাণ হারাতেন।

পরের বছর (১৯১৬)-র মে মাসের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মত জাপানে আসেন এবং তিন মাস থাকেন। এর প্রায় তিন মাস আগে , মার্চ মাসের তৃতীয় দিবসে রবীন্দ্র-ভক্ত কবি মাশিনো পরলোকগমন করেন।

এর পরে শ্রী কিওউ ইগাওয়া (পরবর্তীতে এসুনেতো) তাঁর অকালমৃত মাসতুত ভাইয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কোনও এক খবরের কাগজে (*১) ধারাবাহিকভাবে যে লেখা প্রকাশিত করেছিলেন , প্রধানত সেই লেখা অনুযায়ী কবি মাশিনোর জীবনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।

কবি মাশিনোর বাবা চৌশু (অধুনা ইয়ামাগুচি জেলা) রাজ্যের

একটি ক্ষুদ্র শাখা-রাজ্যের দেওয়ান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মেইজি আমলের গোড়ায় যে রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাদের সময়ে তিনি সপরিবার পাশের জেলা শিমানের অন্তর্গত হামাদা শহরে চলে গিয়েছিলেন। কবি মাশিনোর জন্ম সেখানেই। দু'ভাই ও এক বোনের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন তিনি।

তাঁর ছেলেবেলা অতিবাহিত হয় দরিদ্র অথচ সুখী একটি পরিবারে। একে তো সন্তানদের মধ্যে কনিষ্ঠ, তার উপর আবার আকৃতিতে বেঁটে হলেও, দেখতে সুন্দরী আর স্বভাবে ভদ্র -- মা বাবার স্নেহের পাত্র হওয়া অতি স্বাভাবিক ছিল। হামাদা জেলা স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি মাসতুত দাদা কিওউ-এর প্রভাবে ঐতিহ্যগত ও নতুন ধারা --- উভয় প্রকার কবিতায় আগ্রহী হয়ে টোকিওর 'বুনশো - সেকাই (লেখার-জগত)' পত্রিকায় (*২) নিজস্ব রচনা পাঠাতেন। সম্পাদক মঞ্জীর নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে সেগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হত। সেই কবিতাসমূহে তখনকার দুজন প্রখ্যাত কবি আরিআকে কানবারা (১৮৭৫ - ১৯৫২) ও কিউকিন্ সুসুকিদা (১৮৭৭-১৯৪৫)-র প্রভাব চোখে পড়ে। বিশেষ করে, উল্লিখিত প্রথম কবির প্রতীকীবাদ এবং শেষ উল্লিখিতের পুরোনো শব্দ চয়নের রুচি তরুণ মাশিনোর উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে মাসতুত দাদার মূল্যায়নে মাশিনোর কবিতা যে শুধু কাঁচা অনুসরণ মাত্র তা বলা যায় না। কবিতার এখানে সেখানে তাঁর নিজস্ব সৃজনশীল প্রতিভাও অনুভূত হয়।

হামাদা জেলা স্কুল শেষ করে মাশিনো টোকিওতে এলেন। দু' একটি জাতীয় হাইস্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Arts -এ ঢোকেন। এই সময়ে তরুণদের মধ্যে ইউরোপ মহাদেশ, বিশেষ করে ফরাসী ও রুশ সাহিত্যের প্রতি উৎসাহ বেশী ছিল। মাশিনোও একই প্রবণতায় ভাসলেন। ১৮/১৯ বছর বয়সে তিনি শিমান জেলার সদর মাৎসুএ শহরের স্থানীয় খবরের কাগজে Turgenev-এর গদ্যকবিতা ইংরেজি সংকলন থেকে অনুবাদ করে প্রকাশিত করলেন। ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে তাঁর আগ্রহ ক্রমে রুশ সাহিত্য থেকে Verlaine, Oscar Wilde ও Arthur Symons-এ রূপান্তরিত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে এই সময় থেকে ফারসি ও ভারতীয় সাহিত্যও পড়তে আরম্ভ করলেন, অবশ্য ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে।

জাপানে তখন কলেজে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার জন্য বিশেষ প্রবন্ধ লেখার রেওয়াজ ছিল (এখনো মোটামুটি সেই নিয়মই চলছে)। মাশিনো ইংরেজিতে লেখা যে প্রবন্ধটি পেশ করেন, তার শিরোনাম 'My Definition of Poetry'। তখনকার দিনে ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্য বিভাগে স্নাতক স্তরের চূড়ান্ত পর্বে যারা ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখতেন, তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল। ওই সময় মাশিনো ইংরেজিতে কবিতা লেখার চেষ্টাও করতেন (শুভারো ফুকুদা, 'হাকুমেই - নারু - শিজিন (অকালমৃত কবি)' (*৩)।

ওয়াসেদা থেকে বেরিয়ে তিনি 'ওসাকা মাইনিচি শিনবুন' সমাচারপত্রে যোগদান করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল অবিলম্বে বিশেষ সংবাদদাতা হয়ে বিদেশে কাজ করা। কিন্তু কবি মানুষ তিনি, সাংবাদিকতার জগতে কাজ করার উপযুক্ত ছিলেন না। অল্প দিনের

মধ্যে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তারপর তিনি যাযাবর জীবন যাপনের পথ বেছে নিলেন।

মাশিনো যখন ওসাকায় ছিলেন, তাঁর তখনকার জীবন সম্পর্কে একটি সুন্দর চিত্র মহাকবি কিউকিন্ সুসুকিদার (*৪) লিখন সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া যায়। সেখান থেকে কয়েকটি আকর্ষণীয় অংশ উদ্ধৃত করা যাক --

শ্রীমান মাশিনো তাঁর জীবনকালে ওমর খৈয়াম ও টেগোরের অনুবাদক হিসাবে পাঠক-মহলে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু অনুবাদকের চেয়ে নিজস্ব রচনা সৃষ্টিতে মন দিলে ভাল হত -- এমন ধারণা আমাদের মনে জাগিয়ে তোলার মত কবিসুলভ পরিমার্জিত সুপুরুষ ছিলেন তিনি।' (কিউকিন্ সুসুকিদা, 'যাযাবর কাঁকড়া' সো-মোকু-চু-গিও (তৃণ-বৃক্ষ-পতঙ্গ-মৎস্য-এর অন্তর্গত)

কিউকিন্ ওসাকার সেন্ট্রাল স্টেশন উমেদাতে মাঝে মাঝে মাশিনোকে দেখতে পেতেন। একদিন তার কারণ জিজ্ঞেস করে যে উত্তরটি পেয়েছিলেন, তা অনেকটা এইরকম -- দিনে অন্তত একবার মাশিনো উমেদা স্টেশনে আসেন নিজের যাত্রী-অবস্থা না ভোলার জন্য। এখানে কথাটা একটু বাড়িয়ে বললেও, নিজের জীবনে মাশিনো নিজেকে স্থায়ী বাসিন্দার চেয়ে যাত্রীরূপে দেখতেন বেশী। সেটাই তাঁর স্বভাবের উপযুক্ত বলে মনে করতেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে কিউকিন্ লিখেছেন, 'এই কথা বলতে বলতে শ্রীমান মাশিনোর রমণীসুলভ সুন্দর বড় বড় চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই চোখের ভিতরে আমি দেখতে পেলাম নিরুদ্দেশ যাত্রায় পা বাড়ানোর এক আকুলতা এক টুকরো সাদা মেখের মত তুড়িৎ গতিতে ভেসে চলে গেল।'

সেই ঘটনার দু'তিন দিন বাদে কিউকিন্ আবার মাশিনোর দেখা পেলেন উমেদা স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে। তখন মাশিনো টুপিধার সাদা প্রবেশ টিকিট গুঁজে সফর ছড়ি বগলে নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণকারী ভঙ্গিতে ভিড় ঠেলেতে ঠেলেতে এদিক ওদিক ঘুরছিলেন। এই দৃশ্য দেখে কিউকিনের মনে পড়ে যায় মাশিনোর করা 'জীবন যাত্রী' উক্তিটির কথা। মধ্যযবঙ্গ মহাকবি কিউকিন্ সুসুজিঙ্কত তরুণ কবিটির পশ্চাৎ দিকের অবয়ব অনেকক্ষণ ধরে দেখতে থাকেন।

এবারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদক হিসেবে মাশিনোকে নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

যাঁরা মাশিনোকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, তাঁরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে মাশিনো একজন জাত কবি, চরিত্রে তাঁর অনেক দোষ (যেমন, মিথ্যা কথা বলতে দ্বিধা না করা, বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার ব্যাপারে কাপুরুষতা, ধৈর্যের অভাব, আত্মকেন্দ্রিকতা প্রভৃতি) থাকা সত্ত্বেও, সেই চরিত্রের গভীরে সুন্দর ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের নির্ঝরিত কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হত (কিওউ ইগাওয়ার পর্যবেক্ষণ)। জীবনকালে যে ভাল কবিতা লিখতে পেরেছিলেন, তা নয়, কিন্তু স্বভাবে তিনি সত্যকার কবি ছিলেন। এই তরুণ কবির জাপানে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম দিককার অনুবাদক হয়ে ওঠা এক প্রকার ঘটনাচক্রই বলা চলে।

কবি মাশিনোর অনতিদীর্ঘ জীবনকালে নানারকম চিন্তাধারা তাঁর তরুণ মনে ধ্বংস সৃষ্টি করেছে। রুশ-জাপানী যুদ্ধ (১৯০৪ - ১৯০৫)-এর পরে জাপানি সমাজ দ্রুত পদে সত্যকার আধুনিকীকরণের পথে অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চোটে পশ্চিম ইউরোপের ধাঁচে গড়ে তোলা আধুনিকতার সীমা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেও, অন্যদিকে আবার সমাজবাদের আকার ধারণ করা আধুনিকীকরণ যুদ্ধের সীমান্তে মাথা তোলার উপক্রম করেছিল। নানারকম চিন্তাধারার মধ্যে কোনটা নির্ভরযোগ্য, কোনটা বর্জনীয়, সঠিক বলা সম্ভবপর ছিল না।

তরুণ কবি মাশিনোও ভবিষ্যতবাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রতীকীবাদ প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারার গোলক-ধাঁড়ায় পড়ে অবশেষে নিজেকে ধ্বংস করে ফেললেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথের প্রাণময় কাব্যিক চিন্তাধারার মাধুর্য ও গাভীর্যের সংস্পর্শে আশ্বাস ও সান্ত্বনা পেয়েছিলেন হয়তো, যদিও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মাসতুত দাদা মনে করেন যে স্বভাবের নিরিখে কবি মাশিনোর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে Verlaine অথবা Oscar Wilde আরও মানানসই হতেন।

যাইহোক, কবি মাশিনোর জীবন ও কর্মকে জাপানের আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণজনিত আলোড়নের প্রতীক হিসেবে গণ্য করলে ভুল হবে না। কবি মাশিনো দীর্ঘায়ু হলে কি রকম জীবন যাপন করতেন, তা নিয়ে অনুমানের জাল বোনা যেতে পারে। Yeats -এর মত রবীন্দ্রভক্তি থেকে দূরে সরে যেতেন? নাকি রবীন্দ্রনাথের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় গড়ে নিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আসল অনুবাদক হয়ে উঠতেন? এর উত্তর অবশ্য কোনোদিনও মিলবে না।

পাদটীকা -----

(*১) এই খবরের কাগজের নাম জানা সম্ভব হয় নি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাপান যাত্রা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সব খবর ছাপা হয়েছিল, সেগুলোর কাটিং-এর একটি সংকলন আমি পেয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে। শ্রী ইগাওয়ার লেখাটি তারই অন্তর্গত। কিন্তু খুব দুঃখের কথা, তাতে খবরের কাগজের নাম ও প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় নি। তবে একথা স্মরণযোগ্য যে তখনকার একজন সাধারণ পাঠক এই পেপার কাটিং-এর সংকলন তৈরি করেছিলেন। অর্ধ শতাব্দীরও বেশী পরে সেই সংকলন কান্দা অঞ্চলের পুরোনো বইয়ের দোকান-পাড়ায় বিক্রি করা হয় আর অবশেষে তা একজন ভারত-অনুরাগীর হাতে আসে।

(*২) 'বুন্শো-সেকাই (লেখার -জগত)' : ১৯০৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। মোট সংখ্যা ২০৪। সাহিত্য অনুরাগী তরুণ পাঠকদের পাঠানো লেখাগুলির মধ্যে থেকে নির্বাচিত রচনা প্রকাশিত হত। এঁদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তীকালে লেখক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

(*৩) উপরে উল্লিখিত পেপার কাটিং সংকলনের মধ্যে রক্ষিত।

(*৪) কিউকিনের কবিতা সত্যিই সুন্দর ও উঁচু মানের। পড়লে পুরোনো দিনের জাপানের ছবি স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু তাঁর ভাষা সুন্দর হলেও অপ্রচলিত শব্দময়, বর্তমান জগতের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে পারে নি। তাই এই সময়ে তিনি কবিতা লেখা বন্ধ করে 'ওসাকা মাইনিচি শিনবুন' সমাচার অফিসে যোগদান করেন। কাজ করতেন সংস্কৃতি বিভাগে। পরে এই বিভাগের প্রধান হয়েছিলেন। এই কাগজের জন্য নিয়মিত পাণ্ডিত্যময় ও রসাত্মক রচনা লিখতেন। মহাকবি কিউকিন অফিসে মাশিনোর উপরওয়াল ছিলেন।

আক্ষিপ সুদীপ্তা রায়চৌধুরী



“বন্ধু হবার আশায় , বন্ধু পাবার আশায়
এই দিলাম তোমায়
আমার আঁকার খাতা ।
যে কটি পাতা
রয়ে গেল ফাঁকা
জেনো তোমার জন্যেই আছে রাখা
রঙ ভরে দিও তাতে
নিজের হাতে
নীলরঙা মাছ বা মাছরাঙা -
স্বপ্নবাড়ি , মেঘেদের ডিঙা ।”

দেখি খাতা জুড়ে অনাবিল
মস্ত আকাশ স্বপ্ননীল
আলো আশায় মিলেমিশে একাকার
যেন এক অনুপম দেশ রূপকথার !
রঙে মাখা তুলি, থেকেই যায় হাতে
জুঁই ফোটার সেই নিঃশব্দ রাতে -
পাইনি খুঁজে নিজের মধ্যে
সেই মিলটুকু -- সাধ আর সাধ্যো ।
রাতভর নিঃস্বপ্ন চেষ্টার পরিণামে
খাতাখানা মুড়ে ফেলি স্মৃতির ধোঁয়াটে খামে ।

(২)

তখন স্কুল ছেড়ে কলেজের ছাত্রী
কাঁধের ব্যাগে শঙ্খ ঘোষ , পুর্ণেন্দু পত্নী ।
আবিষ্কৃত করে দেওয়া সবটুকু বোধ
উড়ে এল ছোট্ট এক অনুরোধ ---
‘বন্ধুর হাত বন্ধুর পথে হবে সহায় -
সেই প্রতীক্ষায়
বন্ধু হবার আশায় , বন্ধু পাবার আশায়
কবিতার এই খাতা দিলাম তোমায় ,
পড়ে বল
কেমন হল -

আরেকটা আন্দের
বেহাগ বা মল্লার
কোন রাগে বেঁধে দিও সুর
সে সুরে থাকবে ভরপুর
তোমার আমার একসাথে চলার পথ ,
তোমার আমার সব মূল্যবোধ ।’

খাতা খুলে দেখি
পাতা জুড়ে বিদ্যুতের চক্ৰমকি
উন্মাদ হাওয়া শন্ শন্

শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি বাম্ বাম্ ।
ভিজে যেতে থাকি
শুধুই ভিজতে থাকি
--- আমি তৃষ্ণাতুর মরুভূমি
খুঁজে পাই বন্ধুতার একফালি জমি ।
সেখানেই শুরু হয় কাব্যের খেলা -
সেখানেই শুরু হয় স্বপ্নের মেলা -
তানপুরায় সুর বাঁধার আয়োজন ,
কথায় ছন্দ সুরের অনুরণন ।

অবশেষে খোলা কবিতার খাতা
অর্থহীন কথা , ব্যর্থ সুর গাঁথা ।
যত্নে বাঁধা তানপুরার তার
নেমে গেছে বার বার ।
পাইনি খুঁজে নিজের মধ্যে
সেই মিলটুকু -- সাধ আর সাধ্যো ।
তাই হয়নি ছন্দ বাঁধা
হয়নি কাব্য সুরে সাধা ।

(৩)

পেরিয়ে আসা দীর্ঘ পথ
সাদামাটা বাঁধাগৎ ,
সঙ্গে নিয়ে স্মৃতির পাহাড়
এই ‘হোম’ হল ঠিকানা আমার ।
চশমার ঘষা কাঁচ , দীর্ঘ অবসর
নিস্ক্রম সন্ধ্যা , রাতজাগা ভোর -
কদমের ডাল , শালিখের পরিবার
বন্ধু হয়ে এসেছে বার বার ।

তবু আজ ফিরে দেখি -
যে ছবি আঁকা রয়ে গেছে বাকি ,
হয়নি যে সুর বাঁধা সেদিন
যদি একবার ফিরে পাই সেইসব দিন !
প্রাণপণে দেব মিলিয়ে সাধ আর সাধ্য
ফিরে পেতে সেই পরম আরাধ্য ।
ভরে দেব অন্য ছন্দে গানে ---
অন্য সুরে অন্য তুলির টানে ॥

আমার মা রেখা ভট্টাচার্য

বকুল ফুলে সাজিয়ে ডালা
একলা বসে গাঁথি মালা
মন উড়ে যায় অনেক দূরে
খুঁজে ফিরি সুজনেরে
মায়ের কথা ভুলতে নারি
তাঁর স্নেহের পরশ পেতে মরি ।

মনে পড়ে ছেলেবেলায়
মোদের সাথে কাটাতো
দিন সে খেলায় খেলায়
বাবার সাথে পাল্লা দিয়ে
সাঁতার দিতো যমুনা জলে ।

ছোট্ট গ্রামের মেয়ে উষা
স্টিলেটো আর সিফন পরে
রাজা রানী সহ ভোজন করতো
ব্যঙকুয়েট হলে ।

রাগ করা তো দূরের কথা
বকুনি দিতেও তাঁর হতো মনে ব্যথা
রাতের পরে রাত জেগে
পাহারা মোদের দিতো
পাঠ তৈরীর তরে ।

এমনি করেই সুখে আহ্লাদে

কেটেছিলো জীবনের প্রথম অধ্যায়
মুখে হাসি আর চোখের জলে
নিজের হাতে সাজিয়ে মোদের



এক এক করে পাঠালেন শ্বশুর ঘরে
কাটিয়ে উঠলাম সেই দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নাতি পুতি ঘিরে পূর্ণ সংসার
তাদের মন রঞ্জন তরে
মা নাচে , গায় আর রান্না করে
হাসির বন্যা বইয়ে দিয়ে
ব্যস্ত থাকে সে সকলকে নিয়ে ।

হঠাৎ এক দম্কা হাওয়া
নিভিয়ে দিলো জীবন মায়া
মায়ের ছবি বুকে ধরে
রেখে এলেম ঠাকুর ঘরে ।

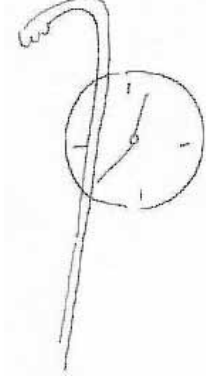
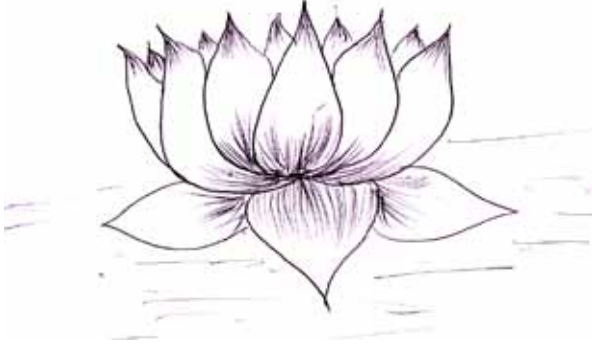
এদিক দেখি ওদিক দেখি
মায়ের মতো পাইনা কাউকে খুঁজি
মালাখানি নিয়ে হাতে
তড়িৎ বেগে ছুটে গিয়ে
পরিয়ে দিলাম মায়ের গলে
এ মালা কেবল তোমায় সাজে
মোর বক্ষ জুড়ে তোমার সুর যে বাজে ।

মন নমিতা চন্দ

মন , ডাকার মত তারে ডাক
মন , ডাকার মত তারে ডাক ।

শিশু যেমন মাকে ডাকে
চায় না খেলাধুলা ,
রাধা যেভাবে ডাকিল শ্যামকে
ডাকিল যেভাবে মীরা ।

সেইভাবে মন দিয়ে ডাকলে পরে
তবেই পাব ঈশ্বর দরশন
তবেই হবে মানব জীবন সার্থক
মন, ডাকার মত ডাক ॥



প্রতীক্ষা অজিত কুমার পাল

জীবন-প্রদীপ সঙ্গে করি
এসেছিলাম ভবে , হরি ।
তেল যে হল শেষ ,
কি রইল অবশেষ ?

চক্ষু মুদি ভাবছি আমি
এবার , আসবে বুঝি জীবনস্বামী ।
তাই ,
হৃদয় মাঝে আসন পাতি
জেগে আছি সারা রাত ;
রাত যে হল ভোর
কই , এলো না তো ,
আমার পাশে , জীবনস্বামী মোর ।

বুঝি , ডাকতে আমি
জানি না কো ;
তবে , কাঁদতে আমি জানি ।
এসো এসো ত্বর করি
আমার জীবনস্বামী ॥

India Calling

Sougata Mallik

I was casually enjoying an afternoon fiesta.

Gone are the short days and long nights of harsh cold and bitter, thrashing winds. Spring is here but with the telltale signs of its advent. The leaves are becoming green and the trees are preening themselves to boast a full shock of foliage. The breeze is more refreshing now - a welcome change.

And so the 15th of April, 2008 was one such beautiful day in Toronto.

The telephone screeched loud - it was a call from the Citizenship Bureau. A few days away, I will be known as a citizen of Canada. This is the country that I have now made my home, a country that is far away from my birth land. Getting through the formalities of the process, I was well accepted of the fact that I would have to give up my Indian citizenship when I became a citizen of this country. But a recent revision of policy furthered a probe into extra details. We were told that we would be able to regain our citizenship as Overseas Citizenship of India (OCI), through the Citizenship (amendment) Act 2005 which India passed recently. This offer gave me an honour beyond fathom and also flooded me with memories, emotions and patriotism. It flashed for me, I have always been an Indian, and always will be, carrying with me the baggage that is the heritage of a nation fiercely driven by success on one hand and oppression on the other and yet holding on to the age old revelations.

I will never forget the day when a renowned professor in Calcutta University, said, "For our boys we get really happy when they make the IAS exams, but for our girls, we are happier when they get married." At that time I was a young student - my life's mission was to get into the administrative service. But I followed the other path instead - got married. I am not blaming my professor; he meant well. Yet he portrayed the zeitgeist of the India for women. Yes - we competed with the men for grades, for power, for money, and then we held back, got married, became somebody's wife, and then a mother. While I do not regret my life, I still wonder

if it was the values that were infused into me during my formative years that had shaped my decision.

Years back, I had married an unknown man and had flown to an unknown country named Scotland. This would most likely make me a first rate gold digger, as my Canadian friends will possibly assess - but that is a separate story. With this unknown man and in all these years of partnership, we have together built a loving nest and have together protected it from rain and shine. From the Far East to the West, we have travelled a lot, learnt new things and experienced new adventures. But at the end of it all, we have remained Indian always.

The second part of this is how the children, born or raised abroad identify themselves. My daughter speaks Bengali language, but cannot read or write. I blame myself that I did not have enough time to teach her the script, which will forever deprive her from experiencing the enriched literature that we have. It is a pity that she will not be able to sleep her children to bed, with the stories from *Panchatantra* or poems from *Sishu*, as I sang to her when she was a little child. But I did teach her our thoughts, our traditions. While she has watched Bollywood movies as "*Munnabhai Lage Rabo*", she has also listened to Pandit Ravi Shankar and saw Satyajit Ray through his films like *Goopy Gyne Bagha Byne*, or *Agantuk*.

But when it came to the point of being an Indian citizen again, it did not interest her at all. She failed to realise that this is not only an honour, but also a privilege that few people can get. She could not tune her mind to the fact that sometime or somewhere we may be required to go back to our homeland. For one, whose heart and soul had not been nourished by the air and water of India, will never realise the urge or joy of return.

Coming to my husband, the prospect of Overseas Citizenship of India was fair enough for him, but not as scintillating as it had seemed to me. He too was born and brought up in India, and

the panorama was happy to him, not fascinating. Practically speaking, he thinks the benefit or advantage will depend on where you are working or having your livelihood. Middle aged men at this stage have to put their professional life first, because they have a mammoth responsibility to secure the future of their families. Wanting something or not wanting otherwise, they are left with very little luxury of making a choice of their own. I understood his feelings.

So that leaves me by myself to rejoice the honour of the unexpected offer of Overseas Citizenship of India. Here I am in the midst of a whirlpool of activities: cruising through a full-time job, fencing

with the daily chores'— yet my joy was immense. The prospect of dual citizenship has brought an added delight to my life. Maybe or maybe not I will return to India someday. But at least it has given me the option and opportunity of making my decision. It has honoured me immensely in helping me keep my integrity and also acquire another.

It is 2 am – early Saturday morning now. A few hours later the sun will rise to hail another day. And I will be my customary self again. Come Monday, I will prepare breakfast, pack lunch, drop Mimi to school, arrive at work. I will also return back to my usual role of a nagging wife and blaring mother – a combination of Indian and Canadian, perhaps? ☺

Quiz

1. What starts with "e" ends with "e" and contains only one letter?
2. What is too much for one, enough for two, but nothing at all for three?
3. Born at the same time as the world, destined to live as long as the world, and yet never five weeks old. What is it?
4. It wasn't my sister, nor my brother, but still was the child of my father and mother. Who was it?
5. What is everyone in the world doing at the same time?
6. What do you break by saying just one word?
7. What question can you never answer "yes" to?
8. What can you hold without ever touching or using your hands?
9. How many birthdays does the average man have?
10. Why can't a man living in the USA be buried in Canada?
11. Is it legal for a man in California to marry his widow's sister? Why?
12. Two men play five games of checkers. Each man wins the same number of games. There are no ties. Explain this.
13. A man builds a house rectangular in shape. All sides have southern exposure. A big bear walks by, what color is the bear? Why?

A Trip to Yosemite National Park

Arup Bose

My first trip to Yosemite National Park was completely unplanned, rather an off-shoot to visit a friend near San Francisco. It was a day trip in summer of 1995, but I was completely struck by the beauty of the wilderness. When we planned another trip to California during Christmas of 2009, I wanted my wife (Suparna) and son (Arpan) to experience Yosemite. We were staying with our friends Jaime and Natalie and their two kids (Anton and Sofie) at Santa Rosa, a beautiful wine country near Napa Valley.

Christmas Day: We left the house around 2pm in two cars, self and Jaime in my car and the rest in Natalie's car. After an hour Arpan threw up as his motion sickness kicked in, he and mom moved to my car. The ride was smooth, before it became dark. We missed one exit and got hopelessly lost for a while and had a detour of 30-40 miles. By the time we found our way we were still 15 miles from the lodge, and we found that the road was closed due to an accident. We decided to stay there (the town called Oakhurst) at Days Inn and had dinner at the only restaurant which was open on Christmas day. We had salad and chicken for dinner. Oh yes, we also had a turkey sandwich from the gas station during the time we were lost. The gasoline price was way down \$1.89 / gallon, which is almost half the price from that of October this year.

Dec 26: We had breakfast around 9am, they even had waffles, pretty good for Days Inn. We stopped at a gas station to get chains for the tire, a



requirement due to heavy snowfall. The owner was a Punjabi guy (almost a kid) who has been living there for two years...amazing! Within a few miles the landscape changed, and it was all white. We



kept the speed at 25 miles or lower. We reached the Tenaya Lodge around noon. There was snow all over, the cars were buried in it. We checked-in and went for lunch straight away. We ordered pizzas and salad. Jaime ordered a big hamburger. After lunch we reserved a day tour of Yosemite for the next day. Later in the afternoon we took the kids for snowboarding, Arpan had a lot of fun. After



snowboarding we went to the indoor swimming pool and Jacuzzi, which was extremely relaxing. Dinner was salad (with blue cheese), penne pasta with sautéed chicken and stir-fry vegetables.

Dec 27: Today we were booked for a Yosemite discovery tour. Since we had no time for breakfast

at the restaurant, I got cereal, bananas and coffee from the hotel Deli. We made it to the lobby at 10am, however our lunch (included in the tour price) didn't arrive for another 20 minutes. Arpan and other kids were given some coloring pages and crayons to keep them busy. Our guide cum driver, Jerry, was an extremely knowledgeable guy who'd lived in Yosemite for 40 years, who gave us lot of information on the trees and wildlife, geology and fire-ecology of the area. The scenery was breathtaking, the weather perfect, the snow all white and sky all blue. We made frequent stops at scenic points like El Kapitan, 3 Brothers, Twin Cathedrals, Half Dome, North Dome, Yosemite Falls etc. The trip was worth every dollar. The kids did not care much of the scenery; however played with snow at every opportunity. The Management of this park is making an extraordinary effort to maintain the fragile eco-system of the forest. We also came to know about the importance of fire in maintaining the ecological balance of the forest. Regular natural (or man-made and managed) fires are necessary for the regeneration of the giant sequoias and pines, and to clear up the weeds and underbrush and to provide enough light for the growth of the oaks. The trees in Yosemite, as a result, are truly spectacular and leave a lasting impression. The day-long trip



left us extremely tired and the kids played in the video game room for a while before dinner.

Dec 28: Time to leave Yosemite, but we are also booked for a sleigh ride in the morning. We got



our stuff packed and got to the lobby for the sleigh ride. We had to walk around 5-7 minutes to reach the horses. The path was covered with snow, and we had a couple of families with us. The ride lasted 45 minutes, with one short break in between where we stopped for some fire to get our blood flowing and drink hot cider (which is simply hot apple juice). By noon we hit the road to Monterrey for our next stop.

Although this is my second trip, I am sure it is not going to be our last, and with a little bit of coincidence and efforts on your part, we could even bump into one-other ☺. 🌀

At Different Ends of the Sea

Sumon Chattopadhyay

COLLEGE. This is a word that holds many different connotations depending on the person. For some, it may mean more academic pursuit; for some, it may mean an opportunity to increase social networks. Others would utilize it as an excuse to get away from parents as far as possible; others would use it to hone their athletic skills and take the first step to being professional players.

For me, it was my first time living in a foreign country for an extensive period of time.

Raised to be bilingual in the city of Tokyo and attending an international school, it was natural of me to consider flying to the United States for my education after my high school graduation. I had no speck of doubt that I will be leaving my hometown behind to fly across the Pacific Ocean to the other side of the world.

It was a very refreshing and eye-opening experience, living in a dorm room with no parents or relatives in the vicinity.

I've also realized that I lead two completely different life styles now that I spend my time in two separate parts of the world depending on the seasons.

Now that I am back in Tokyo for the summer, it felt a little tiring to be living with my parents again, to be honest.

Living in a dorm room gave me many privileges and options that I never had back home. I was able to decide when to go to sleep and when to wake up without worrying about others. I was able to leave the room without having anyone worry about where I was going or when I was coming back. I was able to invite friends over without asking anyone for permission. And of course, it was my room, so I was able to decorate it in the way I wanted it to be.

It took me a while to get used to not having any of these privileges when I came back for the summer. No longer was I able to come back home at four in the morning without having four pairs of sleepy eyes glare at me; no longer was I able to leave without giving specific details on who I was meeting where and until when. Also, in Baltimore, my area of activity was limited to within walking distance of campus (although I did sometimes visit

downtown by using the bus or hitching a ride on my friends cars) and my activities within the university and my friends at college. Here in Tokyo, the train takes me anywhere, and I have high school friends and colleagues from work with many different backgrounds and living in different parts of the city that I spent time with. In fact, I was commuting to the other side of the bay approximately an hour and a half from my house at least five days a week, and most of the time that was where I spent my time.

It really surprises me how much my life here in Tokyo differs from my life in Baltimore.

I'm sure these differences are because I have lived in Tokyo for 18 years of my life and know what it has to offer while I never knew the city of Baltimore until 8 months ago. Hopefully over the course of the next couple of years I will be able to realize how much Baltimore has to offer and be able to feel comfortable living there as much as Tokyo. At this point, I am more comfortable and feel better living in Tokyo than at college, and coming back here for vacations makes me want to stay and not go back to my education. Of course, I let my sense of reason suppress this desire.

It's a funny idea, that I like living in Tokyo where everything is more spread apart and time consuming and where my lifestyle has less freedom. But I guess it is a natural thing since I consider Tokyo my home.

Hopefully this will change, and I will soon feel more comfortable living in the States since I plan to stay there even after my education. Then again, maybe I don't have to feel comfortable at college; once I graduate and start working, I may be able to lead a city lifestyle just like Tokyo somewhere else in the United States.

Don't get me wrong; I enjoy college. But I still love my way of life here in Tokyo too much to be away from it for more than five years, until I finish my education.

College. This word holds many different meanings depending on the person. For me, it was an introduction to a different lifestyle, a revelation that made me miss my old lifestyle, and my motivation to complete my aspirations and create a new lifestyle.

Can we believe the saying “Seeing is Believing”?

Prof. Tsuyoshi Nara

Two Japanese proverbs correspond to the popular English saying above. One is “Ron yori shouko” (literally, ‘Proof is better than argument’). The other is “Hyakubun-wa ikken-ni shikazu” (literally, ‘A hundred hearings are less than one seeing’).

“Seeing is believing” implies that even a skeptical person can believe something he/she sees with his/her own eyes. In other words, one is more inclined to believe what one experiences directly than what one learns indirectly from others.

The United Nation has designated the year 2009 as the ‘International Year of Astronomy’ because it happens to be the 400th anniversary of Galileo Galilei’s astronomical discoveries in support of the heliocentric theory of Nicolaus Copernicus (1473~1543). It is said that Galileo Galilei (1564~1642) proved Copernicus’ theory through telescopic observations of the movements of the sun, moon and other heavenly bodies.

Previously, nearly all people around the world - particularly the followers of Catholic Church - believed that the sun moves round their Mother Earth. In clear weather they saw the sun rising from the eastern horizon and moving high above their heads and finally setting in the western horizon. They saw this phenomenon with their own eyes, and it was obvious to them that the movement was geocentric, that is, the sun was going around the Earth. I am not quite sure whether they thought it was the same sun rising and setting every day or if each day a new sun appeared in the morning and disappeared in the evening. However, I presume that most people adopted the former interpretation.

I can well imagine how shocked they were when they heard Galileo’s heliocentric theory, which negated the traditional geocentric theory authorized by the Catholic Church. These days, nearly all people around the world believe Copernicus-Galileo’s heliocentric theory that the Earth rotates on its axis every day. To put it ironically, they now disbelieve what they see with their own eyes and believe something they are told by scientific (as opposed to religious) authorities.

Today, of course, it is possible for an astronaut to

observe the rotation of the Earth from the window of a spaceship. However, that rare experience is available only to a few selected people, and when they describe their unique experience, a majority of the people who hear it will react in three different ways:-(1) they believe the report of the astronauts, accepting them as authentic, trustworthy persons, (2) they disbelieve the report because they have never had such an experience by themselves, or (3) they neither believe or disbelieve the report as they have no absolute criterion by which to judge its veracity. In other words, they believe the report may be true or untrue, so they simply say that they do not know.

As science advances and educational opportunities expand, the number of believers in certain theories or discoveries made by certain scientists appears to increase year after year, though the general public never discovers or experiences the truth themselves. In fact, their belief is totally baseless, yet they accept and believe as true what scientists describe, as if they are hypnotized or brainwashed.

As an instance let me cite an astronomer’s explanation about the star chart of our universe. Many astronomers claim that with the help of radio telescopes and computers they can calculate the distance of any star or nebula from our Earth. They say that the remotest star is 14.7 billion light years distant from the Earth. (By the way, one light year is the distance covered by light advancing for one full year at the speed of 299 million 792 thousand 458 meters per second.)

Their calculation might be correct, and the light from the remotest star can be observed by anyone with a radio telescope. However, the simple fact is that they have only observed light that was emitted from that star 14.7 billion years ago and has reached the Earth after this unimaginably long journey. This observation tells us nothing at all about the existence of this remote star because it might have already ceased to exist some time during last 14.7 billion years. We actually have no information at all about the current existence of most of the stars or nebulae shown in the present star chart presented

by our astronomers or physical scientists.

The same can be said about a spiritual master's mystical experience. When we hear about some spiritual master's mystical experience, we can react in 3 different ways: -(1) we can believe in the master and take the master's word as true even though we have never witnessed the master's experience, (2) we can refuse to believe in the master's experience because we have not witnessed it ourselves, or (3) we can neither accept or reject the master's story because we have no criterion by which to judge its

credibility.

Now let me conclude this article by asserting that as we choose among the three different reactions abovementioned based on our own intuition or common sense, there is no reason for anyone to accuse or criticize others who react in the other ways. The important point is for each of us to select the way we like and feel happy about, and we are free to do that because there is no absolute criterion to determine any one best way for all. ♪



Sanjib Chanda

Grand Corridor Vision for Asian Economic Growth

R.Ramanujam

On the eve of the 15th Nikkei Future of Asia Conference on 21 May 2009, Prime Minister Taro Aso unveiled his grand vision of an Asian Growth Initiative ‘to achieve dramatic development of a broad range of industrial fields across the entire region’. This included the preparation of a ‘comprehensive Asian development plan’ by the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), ADB, and ASEAN Secretariat to realize an East Asia Corridor through Public-Private Partnership. ERIA has already selected “Mekong-India Economic Corridor” (MIEC) as the first part of this development plan.

Given its abundant capital resources and technological might, Japan’s keen interest in such a project could actually transform the growth paradigm in the entire Asian region. More importantly for India, this would mean enormous growth prospects not only by way of an acceleration of the two flagship projects viz., the Dedicated Freight Corridor (DFC) and the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) but a huge opportunity to develop similar projects to link Mumbai with Bangaluru and Chennai.

Japan has made a commitment to fund the DFC that will form the back bone of the DMIC through the ODA route to ensure its speedy implementation. The 1,483 km multimodal high axle-load corridor on the west coast envisages linking Jawaharlal Nehru Port (JNP) with the inland container depots in the National Capital Region (NCR) at Dadri and Tughlakabad. Japan International Cooperation Agency (JICA) which took over the ODA function from the Japan Bank of International Cooperation (JBIC) in October last has nearly concluded the appraisal of the first phase of the project which is likely to receive an ODA loan of approximately 400 billion yen.

The Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) which will necessarily form part of the grand corridor project has made good progress too. Perhaps India’s most ambitious development project ever, DMIC revolves around the establishment of high impact, market-driven nodes, affording investor-friendly regime by way of self-sustaining

investment regions and industrial areas well connected to both domestic and overseas markets. Sprawling over nearly 450,000 sq km, about 14% of India’s total land mass, the hinterland of the DMIC zone of influence is inhabited by 17% of the country’s population and contributes half of its agricultural output and 60% of its exports.

The DMIC zone of influence extends over six states viz., Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. The main project goals for DMIC are: to double employment potential in five years; to triple industrial output in five years; and to quadruple exports from the region in five years.

Envisaged to be built with an outlay of US\$90 billion, DMIC aims at an effective integration of industry with world class infrastructure comprising state-of-the-art network of ports and airports, rail and road networks, special industrial zones, logistics parks and transshipment hubs, knowledge parks and townships with full urban backup services. Linkages of existing network with DFC through feeder rail and roads will be an integral part of the development process. Located within a distance of 150 km on either side of the DFC, each investment region in the zone will extend over a minimum of 200 sq km while an industrial area will be spread over 100 sq km. These growth centres will offer manufacturing facilities backed up by associated services and infrastructure based on local strengths such as raw material availability, technological prowess and human resources.

The DMIC project also involves construction of 4,000 km of feeder road linkages by respective state governments. 4/6 laning of 24,000 km of National Highways is already being done under National Highways Development Programme (NHDP), and another 1,000 km of port connectivity is being undertaken by the National Highways Authority of India (NHAI). Construction and augmentation of 2,500 km long feeder rail linkages will also be taken up under the project.

It is estimated that three million jobs will be generated by DMIC, in addition to the indirect

employment potential involved in construction, operation and maintenance. Overall, major DMIC activities such as industrial processing, IT/ITES, knowledge centres, logistics and other infrastructure are expected to generate some 10 million jobs.

The economic benefits of a possible extension of DMIC to Bangaluru and Chennai would be colossal. Recent trends in economic engagement between India and Japan explain why Japan is so deeply interested and holds high stakes in India's economic growth. Bilateral trade has doubled from USD 6.7 billion (Japan USD 3.5 billion; India USD 3.2 billion) in 2005 to USD 13.6 billion (Japan USD 8.0 billion; India USD 5.4 billion) in 2008. Japanese FDI into India has multiplied several-fold in the last three years. From US\$ 510 million in 2006, it increased to US\$ 1.51 billion in 2007 and further to US\$ 5.55 billion in 2008. In fact, in fiscal 2008-09, India (US\$8.43 billion) emerged as the No.1 destination in Asia for Japanese FDI surpassing China (US\$6.76 billion) for the first time. This was no surprise in the wake of two successive annual surveys (2007 & 2008) of JBIC that revealed the perception of Japanese corporates of India being the most favoured investment destination ahead of China.

Major Japanese investments in fiscal 2008-09 included the purchase of a 63.9 per cent stake in India's Ranbaxy Laboratories by Daiichi Sankyo, Japan's third biggest drug maker for \$4.20 billion. Toyota Motor Corporation announced an additional investment of Yen 33 billion for its second plant being set up in Bangalore, over and above Yen 35

billion investments announced earlier thus making its total investment in it of Yen 68 billion (about \$680 million). NTT DOCOMO bought a 26% stake in Tata Teleservices for \$2.7 billion. Hitachi's proposed gas turbine captive power plant at Neemrana is one of the identified early bird projects for DMIC. Toshiba Corporation and Jindal South West (JSW) have entered into a joint venture to invest \$250 million to produce super critical steam turbines and generators at a plant to be located near Chennai.

While these are encouraging signs, bilateral economic ties are still far below potential given the obvious complementarities between the two economies. The Japanese have often cited inadequate infrastructure in India as a major impediment to large investments in the manufacturing sector. On the other hand, India requiring as much as US\$ 500 billion for investments in infrastructure in the next five years would like Japan to look at opportunities in the infrastructure sector itself for investment in green field projects. This will require the two governments to explore funding mechanisms which are attractive as well as safe to make full use of the huge Japanese savings estimated at US\$ 15 trillion, lying in bank accounts. The outcome of the ERIA study of the Grand Corridor Project is expected to give a strong fillip to this process for the mutual benefit of the two economies. If realized, this would be a major positive outcome of the global financial crisis and the consequent economic slowdown that has shifted Japan's focus to the need to contribute to Asia's infrastructure development to be able to exploit its huge and growing market. ♪

Quiz Answers

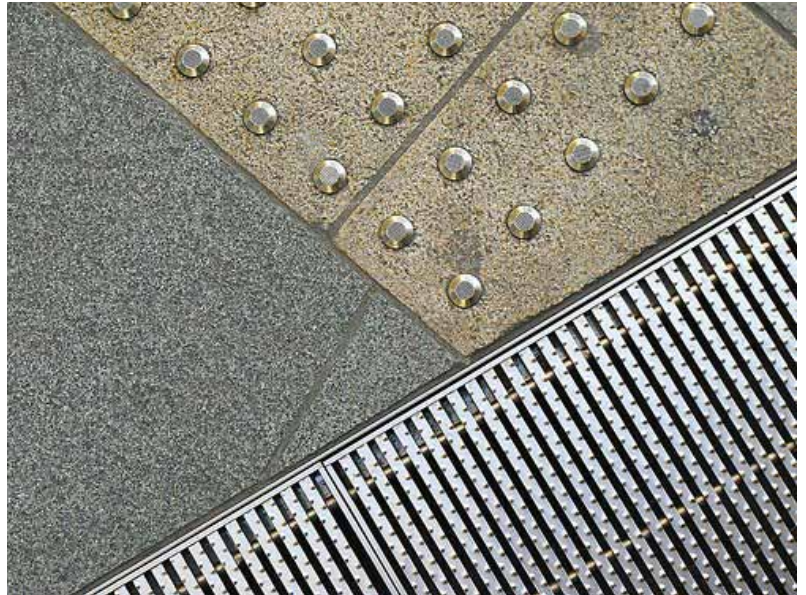
1. An envelope!
2. secret!
3. The moon.
4. The person speaking.
5. Growing older.
6. Silence
7. Are you asleep.
8. Your breath.
9. One birthday -- the day he was born; but he celebrates it yearly.
10. Because he isn't dead if he's LIVING in the U.S.
11. No, because he is DEAD, since his wife is his WIDOW!
12. The two men were NOT PLAYING EACH OTHER!
13. White -- because a house with southern exposures on all 4 sides must be at the North Pole, where they only have Polar Bears.

A Stroll down Ginza

Manmohan Sadana

As I walked down the prime street of Tokyo I realized that walking down the Ginza is like strolling through a glossy magazine - and the buildings on either side are the advertisements. These brand images are largely communicated through the facades, which increasingly resemble screens. Some stores use a facade composed of LEDs while others have huge see through glass panes. It is a sight which can only be experienced because as they say a picture is better than a thousand words --- but a real view is still better. Young damsels are on the pavements distributing leaflets while next to the Sony building one may see a road show by a company trying to penetrate the local psyche. The number of Brands which clutter your mind is boggling and so are the people walking down the street in the height of fashion. Chanel, Gucci, Lui Vuitton, Delsey, Rolex, BMW etc all seem to be fighting for your attention. The luxury brands are not only in the showrooms but also walking down the alleys as Japanese are very brand conscious. I doubt what will be the attention span of a pedestrian who pass from one brand to another in a split of a second.

The irony of the entire ambience began to emerge when I saw raised paths for the blind, made up width-wise of two 30-centimetre-long yellow tiles with several raised lines, stretching through every sidewalk in Ginza. At an intersection or an obstacle such as a tree, the lines turn to circular bumps to warn of a change in path. Otherwise, the path continues perfectly straight ahead. The raised lines and bumps allow the seeing-impaired to navigate throughout the city with the help of the changing texture under their feet. In an environment which was a treat to one's eyes the Japanese had thought about the visually challenged also. Locals do not seem to find the path extraordinary in any way, although most tourists I've spoken to here find it a fantastic resource and I feel the country needs to be complemented for having provided this facility.



The population of Japan is about 125 million. From among this, the number of the disabled is about 4,900,000; there are 2,950,000 physically disabled and 1,950,000 mentally handicapped people living in the society. Among the physically disabled, the numbers are divided by the disability, such as arm and leg disabilities, internal function disorder, hearing and speech defects, and visual defects. The number of the blind and visually impaired is about 350,000 and divided into six stages by its degrees. Grade 1 and 2 are considered as the severe visually impaired and has some privilege under the taxation system. Japan's population is also aging year by year, and the blind and visually impaired over 60 years old accounts for 57 percent of the whole. We certainly need to replicate this facility in the developing world.

During my stroll down Ginza, I was happy to meet one of my friend ---- Verma San --- who elaborated that in a country which takes care of its people it is not surprising that Blind Acupuncture is a nationally recognized practice that has openly existed in Japan since the early Edo Period (1603-1867). Currently, 30 percent of the roughly 90,000 licensed acupuncturists in Japan are blind. These visually challenged are found nationwide, mixed among the sighted at clinics and hospitals, carrying out private practices, and passing on their skills to others like themselves in special schools for the

blind. They hold the same licenses, earn the same wages, and charge the same fees. They even have Zenshinshikai, a National Association for Blind Acupuncturists, to set future agendas and provide a buffer against possible discrimination. Insiders believe that blind acupuncturists have been able to carve out such a lasting niche for themselves because those without sight must develop their senses in ways people with 20/20 vision rarely appreciate. When this heightened awareness is coupled with acupuncture, it seems logical that a

blind acupuncturist may be able to perceive things that a sighted practitioner might overlook a big plus when you consider that acupuncturists never see the organs they're supposed to be dealing with in the first place.

As I completed my stroll and entered my office I realized that while walking down the most beautiful street of Tokyo I had got a glimpse into a society which takes care of its citizens. The Japanese also have blind ping pong and stop lights that play music but that I will elaborate on some other time. ☺

Indian Scientists Association in Japan (ISAJ)

Information provided by Dr. Thadathil Pankajakshan

India has a large pool of scientific manpower and excellent scientists who can collaborate with their Japanese counterparts for the advancement of science whereas the Japanese technology can accelerate the technological development of India. Realizing this fact, Japan and India have been taking various initiatives to enhance S&T (science and technology) cooperation between the two countries to support scientific research in frontier areas of S&T in the recent years. Such initiatives are envisioned to enhance possibilities of complementing each other's S&T efforts. It is now widely realized that the synergy in the field of S&T would be a pre-requisite for a long-term successful industrial and economic cooperation between India and Japan.

In view of the above developments, there have been growing opportunities lately for Indian researchers to work in Japanese scientific and technological research organizations and universities. In this rapidly changing scenario, the researchers felt the need of forming an association such as the Indian Scientist Association in Japan (ISAJ: pronounced as Ai-Saj)) which would provide an organizational framework to promote greater interaction between Indian researchers based in Japan, as well as Indian and Japanese researchers, for the development and strengthening of research networks. ISAJ was inaugurated by Dr. R. Chidambaram, Principal Scientific Adviser to the Government of India in January 2009. The objective of the **ISAJ** is to promote interaction between Indian researchers based in Japan, as well as Indian and Japanese researchers, for the development and strengthening of research networks. At the same time, to provide an information portal for the advantage of Indian researchers on science and technology news, events, funding opportunities, and every nuance of research system in Japan.

The functional headquarter of ISAJ is in Tsukuba with various chapters located in different parts of Japan. ISAJ chapters are already functioning in Hokkaido, Sendai, Tokyo, Kyoto and Kobe. Once registered, ISAJ will continue its function as a "Non-Profit Organization (NPO) for promotion of Science and Technology". Further information of ISAJ is provided in the site, www.isaj.org. ISAJ contact:

Dr. Sunil Kaul, Chairman, ISAJ
Nagakuni Dai 3-24, Tsuchiura -shi
Ibaraki Ken
Japan 300 0810
Tel./Fax. 029 823 8448
Mobile: 080 3584 3130

The Mystery of 'Himba Digamma'

Tapan Das

I guess there is nothing more intriguing, nothing more awe-inspiring or powerful than 'simplicity.' Do challenges seem bigger when we collect innumerable paraphernalia around it? We have perhaps grown into the habit of making simple things get lost in the crowd of complex associations around it. Yet, in spite of the habit, we are quite overwhelmed by the power of unadulterated simplicity, when such an instance presents itself. It all started with a Pujosankhya. Here I was, a well informed tourist, on my trip to Africa, taking in the wonders of the mines, the safari and the tribal handicrafts and nodding knowingly at things that I have already been expecting through a pre-tour Googling on Africa and suddenly my composure got a wee bit of jolt with one of Ibano's comments on digamma. Well, I actually heard 'Dugga ma' in the first instance and immediately gave him my full attention. 'What was it again?' 'Digamma, sir. Digamma.' He said, as I concentrated on his pronunciation and figured out, despite the perennial soft slur that's always present in his speech, that it was 'i' not 'u', a digamma, not a durga ma. Yet, my interest did not quite flag. We were on our way back from the Crown Gold Mines of Johannesburg in South Africa. It had been a tiring day indeed as we had descended to 742 feet down to the fifth lair of one of the richest Gold mines in South Africa. The giant wheel and the crude pulley which worked as a lift, had taken us down to the centre of the earth. Ibano, who acted as our interpreter and guide throughout this journey, was all along with us. His sense of humour and knowledge about the local myths and legends were mesmerizing. His English was intelligible but loud as usual.

Ibano was as intrigued by stories of India that he has heard as I was with Africa. He happened to catch a glimpse of a Pujo Sankhya which carried the photographs of goddess Durga killing Mahishasura 'Hey Mr Das, this looks exactly like our Digamma.' Before I could quite register what exactly he was talking about, he wanted to know where the Buffalo queen was. 'I can only see her head' he said, almost to himself as he took a good look at the picture. I

looked stunned for a while, but I could make out that he was trying to bring to my notice a similar figure which he might have seen somewhere. I sat up straight on my seat and asked "you mean you have seen this image in South Africa". Yes sir, this is Digamma worshipped by the women tribal Doctors of the Himba community of our country. It was believed that only this particular tribe survived when the deadly plague killed the inhabitants of that region including the King and his whole family. The Kingdom and the remains of this royal and magnificent edifice can still be seen which is called the 'Lost City' at the Sun City'.

Finding me a rapt listener, he continued. 'You should meet one of these doctors. They cure anything and everything by touching your body and praying to Digamma.' Now, my well practiced urban skepticism regarding mumbo-jumbo popped up immediately, over riding my curiosity of the Digamma for a second and I smiled to myself. 'There you go,' I thought and remembered all the instances of spooky village doctors in India, with their regular victims. The smirk must have shown on my face. Ibano insisted. "They charge 50 rands sir, and I am sure you will not regret the visit. We call them Himba Digamma doctors."

I was of good health except for level of cholesterol which was above normal. 'Let me try what these doctors have to say about me?' Can you take me there tomorrow?' I enquired. 'Yes', was the quick reply from Ibano. We had a programme for local site seeing and we both decided to skip that programme so that we could see the mysterious Digamma. "I will wait for you at 8 0 clock sharp. I will bring my bike sir. Just pay for the fuel." "Suits me fine, Ibano."

The whole night I could not sleep intrigued by this thought as Digamma and our goddess Durga Maa sounded so similar. The figures according to Ibano also looked familiar. But how on earth a particular tribe in Africa could worship Durga! My curiosity fuelled my imagination and I began speculating. Is there a cultural link between us? Are we the descendents of the same traditions? All these

thoughts were creeping in my mind throughout the night.

Next morning Ibano was there in his colourful attire with a French cap on his head. "It is an hour's journey from here, sir and I have already sent a message that our Indian friend will be there for treatment." We covered a number of villages and reached a hilly terrain. We left the motorcycle at one of the shops and walked for a furlong till we reached Mumba's Clinic. Mumba was a fat Himba lady in a typical dress who welcomed us with flowers. I was told that the eldest female members of the family in this tribe have to take up this tradition. We were taken to a room and offered drinks. Ibano asked in their language about Digamma and wanted Mumba to show us Digamma. Mumba asked us to wash our hands and feet and took us to a nearby room. When the room was opened what I saw was just unbelievable. It was a standing wild buffalo with the face of a beautiful lady, with ten arms standing on a lion, which is one of the 'big five' animals considered iconic in Africa. She had a spear in her hands, piercing a female figure with a buffalo head lying at her feet. Each of the arms had some wild herbs and stems of different colors. White garlands in different shapes which resembled bulbs of garlic were on the necks of both the idols. What a contrast! Sometimes facts are indeed stranger than fiction. They call her Digamma and these women healers heal the common people by praying in front of Digamma and they are cured with the use of roots and dried stems. The whole room seemed eerie because of the awe for the unknown, the mysterious yet overwhelming power that it had.

Ibano forced me to sit on a wooden platform. The healer felt my eyes, pulse and nails and asked me to taste a small herb and tell her the taste. Initially I could not make out what it was. Subsequently, I figured out that the root was salty to taste. She

sat in front of the Goddess and chanted some incantation for about a couple of minutes. Finally, she stood up with smile and said 'My friend your health is in good condition except for 'coles-terol fat'. (cholesterol) which is on the high side. "Just swallow two white garlic pods with honey every morning and walk a mile or dance. Digamma will bless you always". I couldn't help but remember the numerous pathological and bio-chemical tests I had gone through previously in order for my doctor to come to the same conclusion. I felt almost embarrassed for being the technology dependent urbanite that I am! I somehow remembered one of Sukumar Ray's poem where a babu [urbanite] boasts of his load of bookish knowledge to a boatman and remarks that half the boatman's life is wasted if he didn't know answers to big issues of the world. A little later they were hit by a storm and the boatman asked the babu if he could swim and save his own life. For all his theoretical knowledge, he did not have knowledge of this basic life saving skill. The boatman asked, '*santar jano na? tomar jibon to dekhi sholo aanaa i bithal!*' Quite an answer for the babu's pretentious know-all self satisfied attitude! I felt quite like the babu for a moment! A clove of garlic could do the trick, is it? And my doctor and I had made a big issue of it.

Most of the medicines I saw there were garlic of different shapes with some other herbs which I could not identify. Going through Google on my return, I realized how powerful Garlic was as a remedy. Though it was difficult to trace the origin but according to Sushruta, garlic can subdue all diseases. European medical thought eulogizes garlic as the rustic 'Heal All'. The Chinese hold it equivalent to Penicillin. The Greek, Roman and Egyptians swear by this wonder remedy. Well, simple, isn't it? Simple things do not quite strike us, do they? '*Sohoj hova kothin bodo i, taai to sohoj hoyo!*' ❧

Where the Mind is Without Fear

Udita Ghosh

Bursts -and explosions- pierce the still air,
People scream, run. I am frozen in chaos.
Something, it seems, has spilt on the ground,
It looks vaguely familiar – the colour is suggestive.

What can it be? I learnt my colours well.
Red is for roses—*red* that is gushing
From his brown body—*brown*
For earth that he will become.
It must be the thorns, they protect the roses,
But the rose is *youth*, torn while it blossoms,
And *thrown* on the ground at my feet,
Lying and breathing his last breath.

Yet, that can't be it. Red is for the *heart*
That will stop beating in a moment,
Or is it for *love*, that is driving us to tears?
Tears are the *pearls*, that shone like *light* in his eyes--
But the *light* and *fire* in our minds
Was what drove us to seek for answers,
The *flame* burnt strong and we discovered much,
Some wrote, some spoke, some searched and
found.

The *light* is strong and it leads us towards *light*
Light leads to *light*, and *fire* leads to *fire*
Fire, that taught our ancestors to live,
Fire, that we then molded into tools.
We made into weapons that *fire* in our minds
And handed to people to do as they please.
The guns those 10 men hold, they will fire as they like,
They took *fire* into their hearts, and will ignite it in ours.

How can I blame the *thorns*- they seek
Only to protect, they don't hold guns and play,
With *red* for fun, they will not pierce you
If you let the roses be, in the name of a greater
power.

Red after all is not just my *pain*,
Red is for *life* – beating madly in my ribs,
Pulsing in my veins, throbbing in my mind,
Crying in my ears for the noises to end.

Red is for *LIFE* spilt on the ground,

Spilling, spilling, gushing, like a river of pain
--There was another river, only some 60 years
back,
That I remember a woman once told me about,
When light and fire had lit up the sky,
A giant ball of flame that descended on people,
It had burned and scorched them, roasted them
alive,
A *shadow on stone* was all that was left.

The river was there, crying out in pain
Weighed down by all the bodies.
Those who sought water to cool had found
That the touch of water could burn them too.
And so it comes to pass, *water will burn*,
The sublime thread of light in our minds
Will scorch our skins, pierce our flesh,
And wipe out all light, joy and life.

There was a man once that I remember now
His beard and hair of snow and light,
He kept the flame burning strongly in him
And left us with a wealth of words wise.
I turn to him now even as I heed
The voices in my ear of the bodies in the river
On the street before me whisper "*Never again*",
His *prayer* arises once more on my lips:

*"Where the mind is without fear
And the head is held high
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up
Into fragments by narrow domestic walls;
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving
Stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason
Has not lost its way into the
Dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by thee
Onto ever-widening thought and action--
Into that heaven of freedom, my Father,
Let my country awake."*

**This poem was written after the terrorist attack in Mumbai on
26th November, 2008 as a response to the events.*

Your Call

Jyotirmoy Ray

In the silence of night when the darkness falls, no leaves stir,
I hear your call. Each word of yours is like soft loving touches.

As if you are close to me.

I feel so much of turbulence within my mind.

The sensation gradually fills up the empty space within my body.

I yearn to press you hard within my arms to extract your warmth and smell.

Every time I get your call I feel like a tree being shaken by the wind from the sea.

Along with it comes your fragrant breath licking my trembling body.

The throbbing vibration it creates within my heart keeps me spell bound.

It makes me blind to whatever is happening around me,

I can only see a beam of light in your blissful eye

That steers all my senses towards the bottomless depth of love.

Well, don't worry that is all my imagination.

Long stretch of blue sky spreads its limitless wings between us.

I am only to suffer pains being away from you.

Please keep calling.

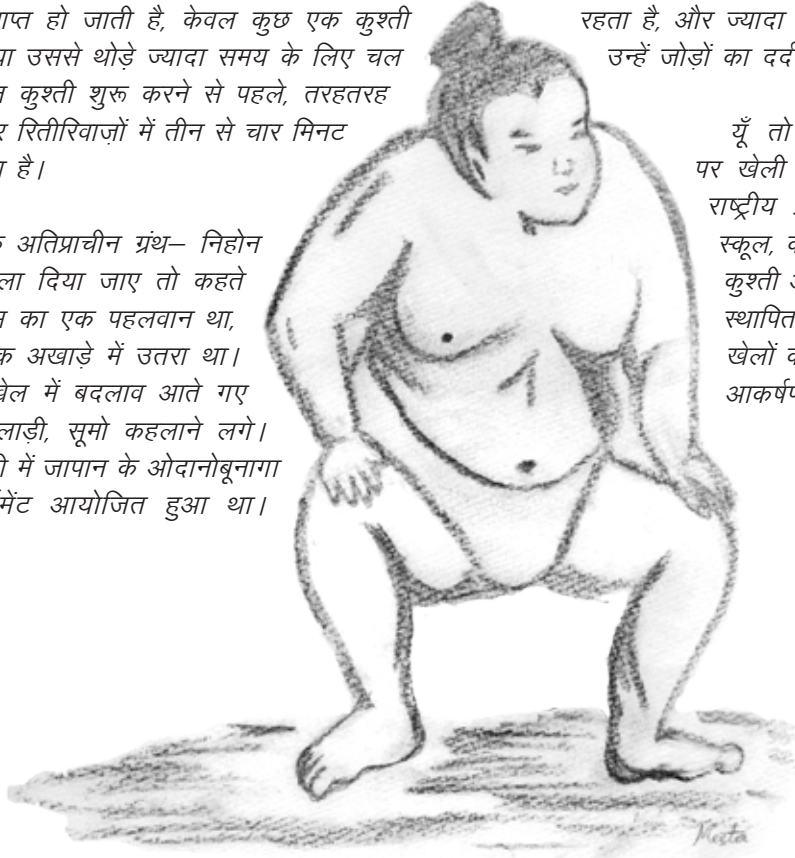


सूमो कुश्ती

गुर्जिन्दर सागू

कुश्ती का नाम आते ही सबसे पहली तस्वीर जापान के सूमो पहलवान की आती है। सूमो का इतिहास, जापान जितना ही पुराना है। सूमो कुश्ती जापान की पुरानी युद्ध कलाओं में से एक है, जो आठवीं सदी में प्रचलन में आई। इसे पहले सुमाई के नाम से जाना जाता था। इसकी जड़ें शिंटो धर्म से जुड़ी हैं। अच्छी फसल के लिए देवताओं के आगे सूमो कुश्तियाँ कराई जाती थीं। सूमो कुश्ती शुरू होने से पहले कई अनुष्ठान किए जाते हैं, और फिर दोनों पहलवान उस घेरे में प्रवेश करते हैं, जिसे दोजो कहा जाता है। दोजो में से बुरी आत्माओं को बाहर निकालने के लिये दोनों पहलवान ताली बजाकर, अपना पाँव जोर से ज़मीन पर पटकते हैं। इसके बाद, दोनों पहलवानों को चिकारामिजु यानि शक्ति वाला पानी दिया जाता है, जिससे वे कुल्ला करते हैं और बाद में चिकारागामी (टिशु पेपर) से वे मूँह पोछते हैं। फिर दोनों पहलवान, शुद्धिकरण के लिए नमक उछालते हुए, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। सारा खेल प्रतिद्वंदी को घेरे के बाहर फेंकने या उसे धराशायी करने का है, और इसमें सत्तर तरह के दाँवपेंच इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर सूमो कुश्ती कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाती है, केवल कुछ एक कुश्ती ही एक मिनट या उससे थोड़े ज्यादा समय के लिए चल पाती है। लेकिन कुश्ती शुरू करने से पहले, तरहतरह के तैयारियों और रितीरिवाजों में तीन से चार मिनट का समय लगता है।

जापान के अतिप्राचीन ग्रंथ— निहोन शोकी, का हवाला दिया जाए तो कहते हैं कि सूमो नाम का एक पहलवान था, जो सुमाई नामक अखाड़े में उतरा था। आगे चलकर खेल में बदलाव आते गए और इसके खिलाड़ी, सूमो कहलाने लगे। सोलहवीं शताब्दी में जापान के ओदानोबूनागा में पहला टूर्नामेंट आयोजित हुआ था।



जैसेजैसे इस खेल को गंभीरता से लिया जाने लगा, प्रोफेशनल सूमो की गिनती में भी इज़ाफा होता चला गया। सूमो कुश्ती में पहलवानों की छः अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, जिनमें माकूची श्रेणी के पहलवान, सबसे मशहूर माने जाते हैं। इस श्रेणी में अधिकतम, ४२ पहलवान हो सकते हैं, और इनमें से करीबन सत्रह से अठारह बढ़िया पहलवानों को मेगाशिरा श्रेणी में डाला जाता है। मेगाशिरा से ऊपर की श्रेणी के पहलवान, सान्याकू कहलाते हैं, जो नियमित रूप से कुश्तियाँ जीतते हैं और उन्हें योकोजूनू यानि कि महान कुश्तीबाज़ की उपाधि से नवाज़ा जाता है।

आमतौर पर पहलवानों का वज़न २५० पाउंड से ५०० पाउंड के बीच होता है, जो कुश्ती में उनके बड़े काम आता है, लेकिन यही वज़न बाद में उनके लिए परेशानी खड़ी कर देता है।

सूमो पहलवानों की उम्र, कड़ी दिनचर्या और बेतरतीब खानपान की वजह से ६० से ६५ वर्ष के बीच की होती है, जो कि एक औसत जापानी की उम्र से १० वर्ष कम है। सूमो पहलवानों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और दिल के दौरा का खतरा ज्यादा रहता है, और ज्यादा वज़न होने के कारण, आगे चलकर उन्हें जोड़ों का दर्द भी रहता है।

यूँ तो सूमो कुश्ती हर वर्ग और स्तर पर खेली जाती है लेकिन इसके लिए कुछ राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं काफी लोकप्रिय हैं। स्कूल, कॉलेज और संगठन, अपने यहाँ सूमो कुश्ती आयोजित कराते हैं। मेइजी संविधान स्थापित होने के बाद, जापान ने कई पश्चिमी खेलों को अपनाया, लेकिन, सूमो कुश्ती का आकर्षण आज भी कायम है।

बाली

मीता चन्दा

द्वीपों का देश "इंडोनेशिया" जहाँ लगभग १७००० द्वीप हैं, जिनमें से लगभग ६००० में लोग वास करते हैं। उनमें से एक छोटा सा द्वीप है "बाली" जो पर्यटन के लिये बहुत ही विख्यात है। यह आश्चर्य की बात है कि यूं तो वहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है लेकिन बाली में करीब ६५ प्रतिशत लोग हिन्दू धर्मी हैं। बहुत से बन्धु-बान्धवों से वहाँ की सुन्दरता के बारे में सुना था। तो इस बार गर्मी के छुट्टियों में वहाँ घूमने जाने का स्थिर हुआ। जुलाई के प्रथम सप्ताह, हमलोग सपरिवार (मैं, संजीव, और निशान्त) जा पहुँचे बाली। टोकियो के नरीता हवाई अड्डे से शाम का फ्लाईट था जो करीब ६ घण्टे के बाद रात को बाली के नगुराह राई अन्तर्देशीय हवाई अड्डे पहुँचा। वहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना था। साधारणतः वहाँ अप्रैल से अक्टूबर का महीना टूरिज़म के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है।

चारों तरफ से नीले समुन्दर से घिरे इस द्वीप में बहुत से सुन्दर समुद्रतट हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं कुता, जिम्बारन, नुसा दुआ, सानुर, चन्दिदास, सिंघराज, लोवीना, सेमिन्याक और लेगियन। हमलोगों का होटल हवाई अड्डे से लगभग टैक्सी में १० मिनट की दूरी पर, कुता तट के किनारे था। यह 'बीच' द्वीप के पश्चिम में स्थित होने के कारण, वहाँ की लहरें बहुत ऊँची-ऊँची हैं, जो सर्फिंग में मदद करती हैं। इसलिए यह 'बीच' सर्फर लोगों के लिये स्वर्ग है। वहाँ मेरे पती (संजीव) और मेरे बेटे (निशान्त) ने भी सर्फिंग किया। इस तट का सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही



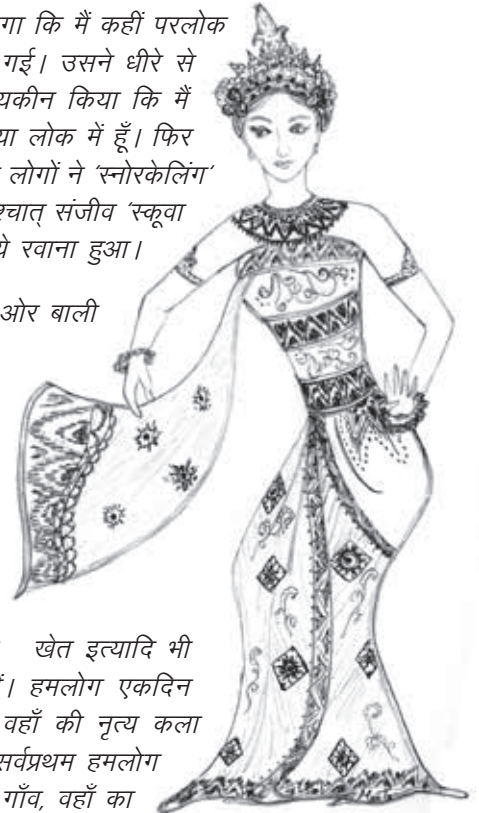
रोमांचक है। दूर-दूर से लोग शाम को यहाँ सूर्यास्त देखने आते हैं। हमलोग भी अधिकतर शाम को कुता 'बीच' पर सूर्यास्त देखने जाते थे, जहाँ हमेशा लोगों का मेला सा लगा रहता था। दूर दिगन्त में डूबता हुआ सूरज देखकर लगता था कि जैसे किसी ने बड़े से नारंगी गेंद को निगल लिया हो। ऐसा सुन्दर 'बीच' पर सूर्यास्त का दृश्य हमने पहली बार देखा था। सूरज डूबने के बाद भी बहुत देर तक आकाश में लालीमा बिखरी रहती। फिर धीरे-धीरे अन्धेरा हो जाता। एक रात खाने के बाद सोचा थोड़ा

'बीच' पर सैर करके आते हैं, वहाँ पहुँचकर हमलोग निर्वाक हो गए। पूर्णिमा की पूर्ण चन्द्रमा की रोशनी में समुन्दर का पानी चाँदी की तरह चमक रहा था, उसपर समुद्र की ठन्डी हवा में खाली पाँव भीगे रेत पर चलने का एक अलग ही आनन्द मिल रहा था। अन्धेरे में समुद्र तट पर बैठकर, थपेड़े मारती लहरों की आवाज़ मन को एक अनोखा शान्ति का एहसास देती है।

दूसरी तरफ पूरब का 'बीच' नुसा दुआ जहाँ की लहरें शांत हैं। इस तट पर आजकल बहुत से पाँच सितारा होटल और रिसॉर्ट खुले हैं। इस बीच पर बहुत सारे सामुद्रिक खेल खेले जाते हैं, जैसे 'पैरासेलिंग, जेट-स्की, बनाना-बोट, फ्लार्डिंग फिश, स्नोरकेलिंग, और स्कूवा डाइविंग'। हमलोगों ने भी कुछ-कुछ इन जोखिम भरे खेलों का आनन्द लिया। 'बनाना बोट' पीले रंग का, बहुत ही नरम रबर का हवा भरा, एक लम्बा सा बोट है जिसमें बैठकर पकड़ने के लिये खाली एक छोटा सा 'हैन्डल' होता है। यह रबर का बोट सामने से एक 'स्पीड बोट' खींचता है। शुरु में मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिये वहाँ बैठते ही मैं उतर कर नीचे खड़ी हो गई और कहा "मुझे नहीं जाना", पर दोनों ने समझा बुझाकर मुझे दोनों के बीच में बिठाया, बोट के ड्राइवर को धीरे चलाने का निर्देश दिया गया, साहस जुटा कर बैठी तो बहुत अच्छा लग रहा था थोड़ा डर भी लग रहा था। अगर कभी ड्राइवर तेज़ चलाता तो निशान्त मेरे सामने से चिल्लाकर उसे धीरे चलाने को बोल रहा था। जब कुछ देर तक चुपचाप बैठकर मैं बनाना बोट के रफ्तार का आनन्द ले रही थी, तो पीछे से संजीव को लगा कि मैं कहीं परलोक तो नहीं सिंघार गई। उसने धीरे से मुझे हिला कर यकीन किया कि मैं अभी भी इस माया लोक में हूँ। फिर बीच समुद्र में हम लोगों ने 'स्नोरकेलिंग' किया। उसके पश्चात् संजीव 'स्कूवा डाइविंग' के लिये रवाना हुआ।

जहाँ एक ओर बाली के 'बीच' इतने सुन्दर हैं, वहीं दूसरी ओर वहाँ की कला, हस्तशिल्प कारीगरी, मंदिर, और वहाँ के सीड़ीनुमा

धान के खेत इत्यादि भी देखने लायक हैं। हमलोग एकदिन गाईड के साथ वहाँ की नृत्य कला देखने निकले। सर्वप्रथम हमलोग पहुँचे बाटुबुलान गाँव, वहाँ का



नृत्य देखने। वहाँ का 'बैरोंग' नृत्य, हमारे देश के महाभारत की कथाओं पर आधारित नृत्य नाट्य है। उस दिन सहदेव का वृतांत चल रहा था। इसमें दो मंच होते हैं, एक में संगीतकार बैठकर संगीत वाद्य बजाते हैं, और दूसरे मंच पर नृत्यकार नृत्य नाट्य दिखाते हैं। उनके संगीत वाद्य को "गेमलोन" कहते हैं, जो बहुत प्राचीन दिन से चला आ रहा पारम्परिक वाद्य है। फिर अन्त में मंच पर कुछ किरदार खंजर लेकर आए और अपने देह पर चुभाने लगे इस नृत्यकला को 'कृस' नृत्य कहते हैं। हमलोग यह देखकर दंग रह गए। बाली की एक और नृत्यकला है 'कैचक' नृत्य जो भारत के रामायण के कथाओं पर आधारित है। हमलोग जब शाम को वहाँ पहुँचे तब अंधेरा हो चुका था, दर्शकों के बैठने के लिये स्टेडियम जैसा सीढ़ी बना था और नीचे मंच दिख रहा था। मंच के बीचोंबीच एक बड़ा सा दीया रखा था जिसके चारों ओर राम और सीता का नृत्य नाट्य चल रहा था। उस दिन सीताहरण का प्रसंग चल रहा था। इन लोगों को घर कर करीब ३०-४० संगीतकार बैठे थे। एक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनके पास कोई संगीत वाद्य नहीं था, वे केवल अपने मूँह से "चक चका चका" का अवाज़ निकालकर संगीत बना रहे थे। उन्होंने खाली एक सफेद काले चेक का सारोंग (धोती) पहना हुआ था जो सामंजस्य का संकेत देता है। अन्त में फिर से हम अचंभित रह गये, जब देखा मंच पर नारियल के छिलके में आग लगाया गया और उसपर एक नृत्यकार आकर नाचने लगा और आग को अपने देह से, और पैरों से बुझाने लगा। उनकी एक और नृत्यकला है, 'लेगोंग' नृत्य, जो हमने एक दिन रात को इंडोनेशिया का भोजन करते हुए देखा। यह नृत्य प्राचीन दिनों में राजा के दरबारों में किया जाता था। इंडोनेशिया का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, कुछ कुछ भारतीय पकवान जैसा।

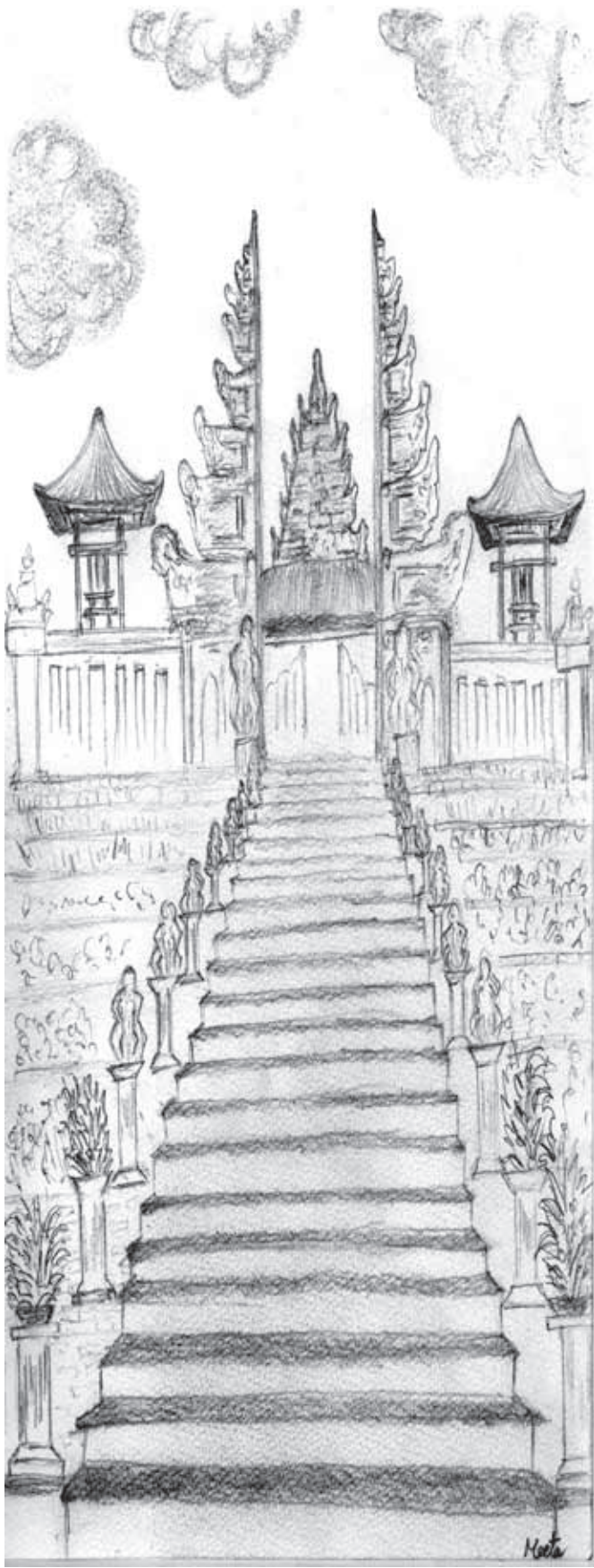
बाली की शिल्पकला बहुत ही सुन्दर है। वहाँ के अलग अलग गाँव, अलग अलग शिल्पकला के लिये विख्यात हैं। उस गाँव के अधिकांश कारीगर पुश्तों से चली आ रही कला को पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहें हैं। वे कहीं स्कूल कॉलेज जाकर वह कला नहीं सीखते, बल्कि घर में परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। हमलोगों को गाईड पहले सोने चाँदी के कारीगरी दिखाने 'सेलूक' गाँव ले गया। सेलूक में हमने सोने और चाँदी के आभूषणों पर बाली की विशिष्ट कारीगरी देखी। वहाँ से हम बाटिक प्रिन्टिंग और कपड़ों की इकत बुनाई देखने गये। कितना परिश्रम और निपुणता से शिल्पी बड़े बड़े कपड़ों पर मोम से चित्र बना रहे थे जिसे गरम पानी के रंग में डाई करते हैं और मोम पिघलकर सुन्दर चित्र उभर कर आता है। इस गाँव में जाते हुए रस्ते में 'बाटुबूलान' गाँव से होकर निकले, जो की मूर्तिकारों का गाँव था। रस्ते के दोनों ओर ढेड़ सारे बड़े-छोटे कई तरह की मूर्तियाँ खड़ी थी। अधिकतर गणेश, गौतम बुद्ध और कुछ देवी देवताओं की बनी मूर्तियाँ दिख रही थी। वहाँ लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बहुत मानते हैं, इसलिये उनके भी कई त्रिमूर्तियाँ थीं। 'मास' गाँव लकड़ी की कारीगरी के लिये प्रसिद्ध है। वह देखकर हम 'उबुद' पहुँचे जो कि चित्रकारों का गाँव था। हमारा गाईड, हमें वहाँ के एक विख्यात चित्रकार का घर दिखाने ले गये। घर में हजारों की संख्या में तस्वीरें लटक रहीं थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा खरीदें, फिर एक पसंद किया।

उस चित्रकार का घर देखकर हमें वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में पता चला, वहाँ के लोग शान्ति और सामंजस्य

में विश्वास रखते हैं। उनलोगों ने हर जगह एक सन्तुलन बनाए रखा है। बाली के अधिकांशतः घर एक जैसे हैं, यह केवल एक चार दिवार से बना घर नहीं है। अपने जमीन के चारों ओर के घेरे में एक प्रवेश द्वार होता है, इस द्वार के दोनों तरफ दो खम्बों पर छप्पर डला होता है, जिसे 'अन्नाकुल अन्नाकुल' कहते हैं। मैं पहले से ही, रस्ते के सब घर देखकर, अवाक थी कि क्यों किसी घर के द्वार में कोई गेट नहीं है। द्वार से प्रवेश करते ही सामने एक दिवार होता है जिसे वे 'अलिंग अलिंग' कहते हैं जो एक पर्दे का काम करता है। अन्दर प्रवेश करने से घर छोटे छोटे भागों में बँटा होता है, वहाँ के सब घरों में एक कोने में पूजा के लिये परिवार का मन्दिर, फिर बीच में दैनिक काम करने का स्थान और अन्त में बगीचा। इस तरह वे अपने दैनिक कर्म में आध्यात्मिक, और प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बनाए रखते हैं। बाली के लोग बहुत ही धार्मिक विचार के हैं, जो कि बहुत ही निष्ठा से पूजा-पाठ और हिन्दू धर्म का पालन करते हैं।

एक दिन हम वहाँ के किंतामनी, बाटुर पर्वत और बाटुर लेक देखने गये। बाटुर अभी भी वहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है। कहा जाता है, बाटुर पर्वत पहले अगंग पर्वत से ऊँचा था लेकिन उसके फटने के बाद अगंग पर्वत बाली का सबसे ऊँचा पर्वत माना जाता है। वे अगंग पर्वत को पूजते हैं। किंतामनी बहुत ऊँचाई पर स्थित होने के कारण वहाँ से बाटुर पर्वत और लेक साफ-साफ दिखता है। यह लेक ज्वालामुखी फटने के बाद कैलेड्रा में बना हुआ लेक है। वहाँ एक रेस्तोरान में हमने दोपहर का खाना खाया, पास का दीवार पूरा काँच का था। जहाँ से बाटुर पर्वत, और उसके ढाल पर काला-काला जमा हुआ लावा, हरियाली के बीच में अच्छी तरह से दिख रहा था। खाना खाकर हम पास ही के मन्दिर बाटुर मन्दिर गये, जिसे उलुन दानु भी कहते हैं। कहा जाता है कि यह मन्दिर पहले बाटुर पर्वत के ढाल पर था, पर १९१७ के ज्वालामुखी फटने के बाद यह धंस हो गया था, बचा हुआ मन्दिर फिर वहाँ से उठा के अभी के स्थान पर लाया गया और फिर १९२७ में मन्दिर का निर्माण शुरु हुआ। वहाँ जाते हुए हम लोगों ने कॉफी, कोको, केसर इत्यादि के प्लान्टेशन भी देखा। वहाँ एक दिलचस्प बात पता लगा 'लूवाक कॉफी' के बारे में। लूवाक एक जानवर का नाम है जो कुछ-कुछ नेवले जैसा दिखता है। कॉफी के बीन्स जब पक जाते हैं, तब यह जानवर इसे खाता है, पर इसे हजम नहीं कर सकता, इसलिए फिर उसी रूप में निकाल देता है। उसके मल में निकले बीन्स को अब धोकर, सुखाकर फिर भूनकर उसे पीसा जाता है, ऐसे लूवाक कॉफी तैयार होता है। जो साधारण कॉफी से बहुत महंगा होता है। वहाँ खेती के लिये मैदान अधिक नहीं है इसलिये पहाड़ काट कर सीढ़ी बनाकर





उसपर चावल लगाया जाता है। जब हम 'किंतामनी' से उतर रहे थे, टेगलांग में हमने वैसा सीढ़ीनुमा खेत देखा। जहाँ हम खड़े थे, वह एक पहाड़ था वहाँ से दूसरा सामने का पहाड़ पूरी हरियाली, बीच बीच में नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कैनवस पर चित्र बना रखा हो। वह दृश्य बहुत ही सुन्दर लग रहा था।

वहाँ से हम बैसाख मन्दिर पहुँचे, जो वहाँ का सबसे पुराना, और सबसे बड़ा मन्दिर माना जाता है। यँ तो वहाँ बहुत सारे मन्दिर हैं, उनमें से इसे सबसे सुन्दर माना जाता है। यह अगंग पर्वत के नीचे स्थित है। इसे "मदर टेम्पल" भी कहते हैं। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, और महेश की पूजा की जाती है। यह मन्दिर बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ के मन्दिरों में घुसने के लिये सबको एक सारोंग पहनना पड़ता है। हमलोगों को हमारे गाईड ने सारोंग दिया। इस मन्दिर में प्रवेश करने के लिये बहुत से सीढ़ी चढ़ने पड़ते हैं। एक और मन्दिर जो सूर्यास्त के समय बहुत सुन्दर लगता है वह है, तानाह लौट। यह मन्दिर समुन्दर के बीच में स्थित है। डूबते हुए सूरज के साथ इस मन्दिर का फोटो बहुत ही सुन्दर आता है। ऐसा लगता है जैसे वह मन्दिर पानी में तैर रहा है। वहाँ बहुत से सुन्दर मन्दिर हैं, जैसे उलूवातु, तमन आयुन, गोआ गजा आदि। बाली के मन्दिरों का ढाँचा हमारे भारत, जापान और चीन इन सबसे अलग है।

उबुद का बाज़ार बहुत ही बड़ा है। पूरे बाज़ार में वहाँ के हस्तशिल्पी द्वारा बनाए गए सामान बेच रहे थे। बाज़ार के पास ही उबुद का राजमहल था, पर्यटकों के लिये, उसके अन्दर जाने की अनुमति नहीं थी इसलिये हमलोग केवल आसपास देखकर निकल आये। हमारे एक गाईड का नाम 'दीर्घायु' था, मैंने उत्सुकता से उनसे पूछा कहीं इसका मतलब लम्बी आयु वाला तो नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ वही मतलब है। और बहुत प्रसन्न हुआ, बातों ही बातों में पता चला उनके भाषा में बहुत सारे शब्द संस्कृत के हैं, जो आसानी से समझ आ रहा था। उनलोगों का ओउम हमारे से कुछ कुछ मिलता है।



देखते ही देखते, हमलोगों का वापस आने का दिन निकट आ गया। पता ही नहीं चला, कैसे पलक झपकते ही एक सप्ताह गुज़र गया। हमारा रात का फ्लाइट था इसलिए हम लेट चैक-आउट करके, फिर बीच पर सूर्यास्त देखने गये। जब तक अंधेरा नहीं हुआ, हम वहीं बैठे रहे। वह सूर्यास्त की छवि मन में बसाकर हम सूर्योदय के देश जापान की ओर रवाना हुए। ☺

हिरोशिमा की याद

सुरेश ऋतुपर्ण

बचाए रखना जरूरी है
हिरोशिमा की याद
हिरोशिमा की याद ही रोकेगी
और हिरोशिमा होने से।

इसलिए कहता हूँ जले जिस्म पर
फफोलों के निशान
और खोपड़ी से
अचानक उखड़ गए बालों की
तस्वीरों को बार बार दिखाओ

उस चमक के बारे में लिखो
जिसने रोशनी नहीं
अँधेरा भर दिया था चारों ओर

उस काली बारिश के
चित्र बनाओ
जिसने खेतों में गेहूँ नहीं
कैसर के पौधे उगाए थे

उस भट्ठी के बारे में बताओ
जिसके ताप से लोहा पिघल गया

लोग भूलते जा रहे हैं
हिरोशिमा की वह सुबह
जब घड़ी में ८:१५ बजे थे

जब आसमान का सूरज
धरती के सूरज से हार गया था

भूलते जा रहे हैं लोग
उस चमक की बात
लाखों भट्ठीयों के
एक साथ धधकने की बात
पत्थरों पर छपी
परछाईयों की बात
लोग भूलते जा रहे हैं।

भूलना उनका स्वभाव है।
भूलेंगे नहीं तो
जिन्दा कैसे रहेंगे?

लेकिन जिन्हें नहीं मालूम
हिरोशिमा का सच
उन्हें कौन बताएगा
जब हम नहीं रहेंगे
तब हमारे बेखबर बच्चों को

कौन समझाएगा
अणुबम की आग का मतलब?

जल्दी ही हिरोशिमा और
नागासाकी
शब्द भर रह जाएँगे

उस महाविनाश का हाल बताने
वाला

संजय भी जब चला जाएगा
तब कोई कैसे जानेगा

कैसे बरसी थी आसमान से मौत
और अनगिनत लोग

एक बूँद पानी को तरसते
भाप बन उड़ गए थे।

कैसे जान पाएँगे हमारे बच्चे
या बच्चों के बच्चे

कि आज हिरोशिमा की मात्सुगावा नदी में
बहती रंग बिरंगी कन्दीलों में
जलती मोमबत्तियों की काँपती लौ
उनके पूर्वजों की ऐंठती देह
की परछाईयों हैं।

इसलिए कहता हूँ
बचाए रखना जरूरी है
हिरोशिमा की याद
यह याद ही रोकेगी
और हिरोशिमा होने से।



माँ को अर्पण

मोहन चुटानी

शक्ति दो माँ
सर्वस्व को अर्पण करने की,
बदले में माँ
तुम्हारे चरणों की रज पाने की।
तिनका तिनका जोड़ता मानव
खो जाता है संसार में,
तुमरे बिन कौन उसका
जब नैया फंसती है मझधार में।
चंचल मन अशांत हमारा
माँ तुमरी शरण में आया है,
कृपादान और आशीष तुम्हारा
लेने को तुमसे फिर आया है।
भव्य ऊँचा द्वार तेरा
एक एक पौड़ी चढ़ जाँ हम,
हाथ पकड़ कर थाम लेना
कहीं फिसल के गिर जाँ हम।
संगी साथी साथ चलें
तेरा ही जयनाद हो,
खुशियाँ फूलें, सब फलें फूलें
सर पे तेरा जब आशीर्वाद हो।



लटकती तलवारें

सुनील शर्मा

आज घुट कर दम निकला फिर किसी का।
बहशीपन के दहकते अंगारों में ॥
आज फिर जल गया है चमन किसी का।
उन खामोश चमकते तारों में ॥
फिर दफन हुई है झोपड़ी गरीब की।
उन होटल पांच सितारों में ॥
चन्द लोगों ने शान शौकत के लिए।
शराफत बेच दी बाजारों में ॥
हवाला के हवाले में वतन के नेता।
बिक गए अदद हज़ारों में ॥
इतना बदरंग हो गया आँखों का रंग।
कुछ न रह गया बहारों में ॥
शराफत और भलाई की तहजीब।
दफन है तंग मज़ारों में ॥
अब शहनाई कौन सुन पाएगा।
इन ढोलक और नगरों में ॥
आज घुट कर दम निकला फिर किसी का।
इन्हीं लटकती तलवारों में ॥

अकेला

माधुरी वुजाली

कमरे की खिड़की से फान्द कर
आती हुई
पीली चमकीली नवयौवना
प्रातः कालीन धूप
जब खाट के
एक छोर से
दूसरे छोर तक
पहुँचती है तब

मैं लीन होता हूँ
विचारों में
और विचार लीन
होते हैं
कविताओं में

धूप को इसका क्या ज्ञान
वह मेरे शरीर पर
अपना रंग जमा कर इठला रही है
और कविता आत्मा को अपने
रंग में भिगो कर
चुपचाप खिसकती जा रही है।

मैं कविता को पकड़ने की कोशिश में हूँ
और धूप मुझे
फिर कविता, मैं और धूप।

इसी भाग दौड़ में मैं थकता हूँ
धूप मेरे ऊपर विजय पा रही है
और मैं अनिच्छा धूप के कब्जे में पड़ा हूँ।

अचानक विचार का तकाजा
धूप तेज़ है
मैं उठता हूँ
धूप का प्रवेश निशिद्ध करने
खिड़की बन्द करता हूँ।

अब मैं फिर खाट पर हूँ
किन्तु धूप तो खिसक गई
अपना विचार विपथ हो उठा
और कविता हाँथ छोड़ गई।

अब मैं बैठा हूँ अकेला
न कविता है न धूप॥



「わっこひろば 宙そら」へ向けて

子育てアドバイザー 山田 さくら

あ の ね …

あのね かあさん
わたし とべつよ
ピョーンと ひといき
ヒマラヤまで

あのね かあさん
わたし あったよ
しろーい ゾウに
あのアスワッタのもりで

あのね かあさん
わたし みつけたよ
あまーい みず
あのネクターのうみで

あのね かあさん
わたし おしゃべりしたよ
かみさまたちと
バンヤンのきのしたで

あのね かあさん
わたし おどったよ
かぜのように ひかりのように
シバのおひざで

あのね かあさん
わたし かえるよ
はじめもない おわりもない
むげんのあなたに いだかれて

ロビンドラナート・タクルの教育論を読んだ。読みながら、「そう！その通り！」「やっぱり、そうだよ！」「ほんと！ほんと！」などと一人で相槌を打ちながら、改めて彼の意見に熱く共感。

いつも思うことだけれど、子ども達を育てていく上でのヴィジョンやバックボーンは、人種や国を超えて普遍なのだ。それなのに、私達は、大切に守らなければいけないものをすっかり置き去りにし、混沌とした世界に迷い込んで脱け出す方法すら見失いつつある・・・

彼の言葉のほんの一部をここに引用してみたいと思う— 光明を見出し、迷路から脱出できるだろうか？

『子ども達は、自然の事物に囲まれていなければならぬと私は信じています。自然の事物はそれ自体の教育的価値を持っているからです』

『神は、子ども達が大自然の中でのびのびと教育されることを意図された』

『育ち盛りの間は、自由ということが精神にとって不可欠である。そして自由は、大自然の懐の中に豊かに備えられている』

『西洋流の学問が、なぜしばしばわれわれの役に立たないのか？真の理由は、西洋流の学問そのものの中にあるわけではない。われわれの実情がそれに合わないという点にあるのだ』

『もっとも偉大な教師である自然は、型にはまった教科を信じ、生命のかよっている教科を信じない人間の教師によって、すべての歩みを邪魔されるのである。それゆえに、子どもの心の成長のすべてが、傷つけられるだけでなく、ひどく台無しにされてしまうのである』

『この理想をわれわれ8 Cはヴィシユワ・バーラティで実現しようとした。われわれは学校の活動のすべてに、調和というこの理想を含むように努力した』

おそらく、ロビンドラナート・タクルが掲げた教育の理想とは、試験の成績優秀者を育てるということでは、決してなく、思考力と想像力を養っていくということ、それは取りも直さず生命力と生活力を育てていくということに他ならなかったのだ。

私達人間は、「人間もまた、自然の一部」であるということをつっかり忘れ、今や宇宙の摂理さえも司ろうとしているのではないかとさえ思える。

リーマン・ショックで、100年にあるかないかの金融危機だの北朝鮮の核実験、イラン大統領選の不正騒動、世界規模で感染が広がっている新型インフルエンザ。日本政府もまた、臓器移植法案やエコ減税・ブレにブレ混乱をきわめ、右往左往してやたら騒がしい。まさにカリ・ユガ。

狭い空間で規則に縛られ、遊びも中途半端のまま、毎日を消化不良で過ごしている日本の子ども達の子育て事情・・・発達障害児の急増も自然の中で遊ぶ環境から遠のいてしまったことと決して無関係ではないように思える。そんな子ども達の将来を思いやるなら、気づいた人間が子ども達のために立ち上がるしかない！！

マーヤーの世界に夢中になって、ずいぶん遠くまで来てしまった迷子のような私達だけれど、もう戻らなければ。次の世代まで迷子にするわけにはいかない。戻るためには、ロビンドラナート・タクルがおっしゃっているようにキーワードは、「自然」。

そこで、私は「わっこひろば 宙そら」を立ち上げ、子ども達が身近な自然の中で思いきり遊べる、場所探しをするための準備中。

早くスタートさせなければと焦っていたら、あるインドつながりの友人に「アステ アステ ティカチェ」と言われて、フッと我に返り自分のペースを取り戻さなければいけないことに気づかされる。しっかりと準備をして、「わっこひろば 宙」が一日も早くスタートできることを祈っている。適った場所に出会えますように・・・そして、一人でも多くの子どもと一緒に、元気な「わっこひろば 宙」を築いていくことができますように・・・

インド人と結婚したマカオ人の私 (結婚式編)

クリスティン・バナジ

日本に来てから、気が付いたらもう8年間立ちました。早かったなと思いました。主人と知り合ったのは12年前の日本への留学の時でした。お互い交換留学生であり日本語のレベルも同じため、一緒のクラスでした。人数があまり多くなかったので、すぐに友達になりました。私にとって、インドはとても不思議な国でした。マカオでは、インド人はあまり多くありません。インドカレーも一回か二回しか行ったことがなく、本当にインドの知識はまったくありませんでした。もちろん、主人は私のはじめてのインド人の友達でした。

インドのことを少しずつ教えてもらって、だんだん分かってきましたが、理解しづらいところがたくさんありました。例えば、インドでは“彼女”というイメージがないです。お見合いは当たり前で、結婚相手は両親が決めるのは当然だと考えられます。でも、その時、主人と4年間も付き合い合っていました。二人は結婚することが決まって、マカオの両親は大丈夫だと言ってくれましたが、彼はインドの両親に話すためにちょっと時間がほしいと言いました。とてもショックでした。自分でプロポーズしたのに。1年くらいかかって、やっと彼はインドの両親を説得できて、二人の結婚を納得してもらえました。それで、分かったのは、インドではマカオと違って、結婚は二人のことではなく、家族のことだと考えていることでした。

それから、やっと結婚式の準備が始まりました。マカオでは、結婚式の準備は大体新夫婦がするのが普通で、招待状から衣装や料理まで全部新郎と新婦が決めます。結婚式は一日で行います。順番は：



早朝—まず新郎の方から十数人の男性のお友達や親戚を集めて、朝から十数台車で新婦の方に迎えます。午前中—“結婚式”は両方の家を行います。1時間もかからないくらいです。

午後—そして、新婦と女性のお友達や親戚十数人と一緒に車で、マカオを一週回しながら、写真を撮ります。そう、二、三十人一緒に！マカオでは決して珍しくないことですが、皆さんは結婚式用の車を見たら、すぐ分かります。夕方—披露宴を行います。披露宴は日本とよく似てますが、人数的には日本より多いです、数百人のは一般でしょう。

それで、マカオの結婚式が一日で終わります。インドでは結婚式の準備は家族か両親がするのが大勢です。もちろん我々はインドにいなかったため、ほとんど彼の両親に準備していただいて、とてもありがたく思いました。インドでは、結婚式って、本当の“式”なのだと思います。

インドの結婚式は一週間かかるのは一般だと聞き、

とても驚きました。一週間もかかるの〜と思いました。けれども、私はインド人ではないため、式は簡単にしようと思いました。そうはいっても、全部式が終わるまで4日間かかりました。West Bengalの伝統の結婚式をほとんど行いました、Sanskrit語の祈りや火のお回りや台に載せて男性達が運ぶなど、まだはっきり覚えています。それに、朝起きてから結婚式を行うまで、食べてはいけませんでした。我々の場合は式が夕方になったので、結局その日夜9時まで何も食べませんでした、それにもかかわらず、最初の結婚の日は、新郎と新婦は寝てはいけません。朝4時に起きて、いろいろやったけど、その日の夜は寝ませんでした。



次の日になると、火の式を行いました。両親が式を家ですると決めたので、インドではだいたいお祈り(puja)の部屋がありますが、あまり広くないのです。長さ20センチと太さ5CMの薪を8段階を載せて、火をつけました。

火をつけたら煙もだんだん強くなって、その後、部屋の中に煙しか見えませんでした。目と呼吸がつかなくなって、寝不足もあり、私は涙が出ました、とても恥ずかしかったです。二日目の夜は二人が会ってはいけませんでした。



もう一つ印象に残ったことは私のサリーと主人の白い服を結んでました。結婚式は4月下旬なので、とても暑かったです。重くて厚いサリーを着ていました。私にとって、このたびのことはすべて初めての経験でした。熱いのに、サリーを着て、主人の白服と結んで、トイレに行くときも、持って行きました。とても不思議でした。

今の話だと、私はインドのことが嫌かなと思われるかもしれませんが、実は私はとてもインドのことが大好きになりました。結婚式はいろいろなことを体験して、本当に感動しました、一生忘れられない結婚式でした。その影響で、インドの友達の結婚式に参加するのも楽しみなことになりました。 ♪

赤ちゃんの成長を祝い・・・こんな事してみました!

サーカー 美紀

これまで、結婚式にまつわるエトセトラ。お盆にまつわるエトセトラ。方言にまつわるエトセトラと綴ってきましたが、やっとここにきて自分自身についてのエトセトラを書くことが出来ることになりました!

「赤ちゃん」の祈願とお祝い事にまつわるエトセトラを今回は、綴りたいと思います。

私自身は、特に信心深い訳でもないです。ただ其々の「記念日/イベント」を、この機会を逃したら、やれる機会はもうやっとは来ない・・・。そんな思いで私にも出来る事、私達夫婦にでも出来る事をちょこっとしてみました。

☆安産祈願☆

まずは、これ。私にとって叶うものなら絶対叶えたい(たかった)安産祈願に、雨がしとしと降る平日の午前中、日本

橋の**水天宮**に行ってみりました。もちろん参拝者は、ばらばら。ご祈願は、毎日30分間隔で行われているようで、もちろんその日は、私達夫婦二人だけで御神殿の前で御祈願をして頂きました。うちの旦那は、「インドにBull Templeがあるように日本にはDog Templeがある。日本人は、犬に楽な出産の願いをしに行くもの!」と、インドでは、牛やハヌマーン等の動物を祀り、日本は、犬を祀るんだ!と妙に納得し、親近感を抱いていたので、折角なのでそのままに。私の理解も正確ではなく、水天宮は、ある特定のお犬様を祀っている訳ではないんですね。あくまでも犬は、

安産のシンボルとしての扱いの様です。「安産だと言われている犬にあやかりたい思い」と「安産祈願の水天宮」が一緒になったってことなのではないでしょうか。それと「妊娠五ヶ月目の初めの戌の日」とは、どうゆう繋がりなのでしょう。いつか調べてみたいです。



その日は、安産御守とお札と腹帯を頂きました。あとは、お札を正しい方角に供え、お守りを身に付け、腹帯を巻く。出来る事は、したつもりでしたが・・・。

☆帯祝い☆

そして妊娠5ヶ月目に入った、初めの「戌の日」、10月1日に水天宮で頂いた**腹帯**を出産予定の病院で、**着帯の日**のイベントとして巻いてくれました。

ちなみに水天宮では、腹帯を『鈴の緒』と呼んでいきます。神殿の神様を呼ぶあのガランガランなる鈴から垂れ

ている紐です。定期的に交換することで、使い古したその紐を頂き、お腹に巻いていた妊婦さんが安産に恵まれたことが始まりらしいです。



その日は、助産師さんに巻いてもらった腹帯をしたまま電車で自宅まで帰ったのですが、人間何ででしょう? お腹に何かを巻くと『ポン』って叩きたくなるのは、何気なく『ポン』、『ポン』叩いていたのに、最寄り駅辺りで気付き、お腹の中では妙な衝撃波を感じていたことでしょう。その後は優しく摩りながら帰りました。

☆へその緒☆

安産祈願も空しく、緊急帝王切開になってしまいましたが、二人ともすこぶる元気に入院生活を過ごすことが出来ました。術後二日目に頂いた、木箱に入ったのが

『**母と子の絆**』です。これって日本だけなのではないでしょうか。まずインドでは、そんな習慣がないのは、確かですが、ものがものだけに、旦那は、『はあっ!?』って感想を述べたきり、その後話題にものぼりません。病院の婦長さん曰く、『もし子供が、不治の病にかかった時は、このへその緒を煎じて飲めば治るとも言われているのよ〜。』とは、臍帯血のドネーションと通じるものがあるんだなって思いました。

ところで旦那は、『いつ髪の毛切るかな〜♪』って、だんだん枕で擦れて、おまけに自分で引っ張るので日に日に『生まれたばかりのツバメのひな』みたいになりつつある息子の頭を撫でています。生まれた時の髪の毛を切り、赤い布に包み、カリー寺院へ奉納するんだって言うのですが、『ツバメのひな』に、ふさふさの毛が生えてくるのは、いつのことやら・・・。



☆命名☆

病院のベットで姓名判断本を片手に悩んだ息子の名前。**お七夜**の出生後七日目までに命名するのを目標に、友達にヒントをもらったり、妹に漢字を聞いたりしながらやっとこさ決めました。でも最初から候補に挙げてた名前の一つに落ち着いただけのことなのですが。名前を決めてほしく頼んだ祖父には、『自分たちの子供なんだから、夫婦できちんと調べて決めなさい。』って言われ、調べるべきだと言われた**名前の画数**。「名字」と「両親の

名前」との相性のいい画数にしなさいと。やっぱりよく判断付きませんでした。「じいちゃん。うちは、カタカナなんだよね・・・。」

名前は、日本名を私が、インド名を旦那が考えました。それぞれが相手からのアドバイス（要望）と最後の確認を得てこれに決めたのですが、日本名への彼のリクエストは、『純日本風な名前。山とか川とかの名前。富士山とか。多摩川とか。』『～山』がつく名前って、相撲の力士かあ！？そこで音に、『やま』が入っていて、日本風というより、直球で『日本』を意味する『大和』となりました。

事前に頼んでおいた習字の上手な親戚のおばさんに書いて頂いた命名書、今もまだお家の一角に飾ってあります。彼の月の誕生日には、この前で記念写真をパチリ。毎月撮りためています。



☆内祝☆

インドでもしますよね?! 『御振る舞い』。いい事があった時は、周りの皆さんに、『何か』振る舞うこと。内祝って親戚や近い方々に、お知らせを兼ねての『御振る舞い』／一緒に幸せを分かち合うってことですよ?! しかし、しかし現代は違い、頂いた御祝金や贈り物へのお返しの品が、内祝となっていますよね。

旦那には、お祝金等を頂くと毎回、『お断りしなさい。お返ししなさい。何でそんなに、スツと受け取るの?』と後ろで突つかれること度々。「お付き合いのある方々」との冠婚葬祭の礼儀。元を辿れば、家族・地域との係わり合いと理解し、おこなっていくことも必要なのかなあ・・・と最近では思えるようになってきました。



今回、『親とお付き合いのある方々』へのお返し／内祝の品は、「大和」って名前

入りのカステラにしました。「洗剤セットでいい!」という母を何とか押し切りました。でもほんとカステラ屋さん、商売上手です!

☆100日祝☆

インドいうなら、Annya Prahasonでしょうか。百日祝、

お食い初めを自宅で、家族三人でしてみました。メニューは雑誌とインターネットを参考に、山と海の物の煮物(筑前煮)、お頭付きの魚(鯛)、お赤飯、蛤のすまし汁、梅干し。本来なら一番重要かもしれない『小石』は、そこら辺の小石という訳には、いかないようだったので、準備しません、出来ませんでした。また赤ちゃんの為に揃えた食器で、祝い膳を用意するのが、本来のやり方ようですが、そこは家族三人で、ちょこっとするのが目的。和風の食器ではなく、たくさんコンパートメントあり、マグカップとスプーンも一緒に付いている、子供食器に私の手作り料理を並べてお祝いしました。



子供の将来を願う気持ちを込めた、一品一品だということに、たいへん興味をそそられます。日本の食文化／料理「道」の奥深さに感動するところです。旦那の『日本大好き』の“ツボ”が、この辺りなので、材料の買い出しや調理待ちも、目をキラキラさせながら応えてくれるので、結構やっている方も楽しいです。

『将来のご縁がありますように』二枚貝の蛤のおすましに浸したスプーンをちょこっと口に付けたら、ビックって身体を震わせた息子くん。また『シワシワになるまで、長生きできますように』梅干しを突いたお箸をお口に付けたら、またまたビックとした彼。その反応に、私達夫婦は十分楽しめました。最後は夫婦二人で、お祝い膳を食しました。我ながら美味しかったです。

願いは、彼がこれからも健康で健やかに育ちますように・・・。さて次は七五三かな!!! ☺



インドの踊り

チャンドリー・ガングリ



私の生まれた国であるインドの踊りについて、ご紹介します。



これは、インドの伝統的な踊りです。インドには、クラシックダンスが8つあります。表現の仕方は踊りごとに違いますが、ダンスには2つの共通点があります。1つめは、お寺から始まったということです。2つめは、古い叙事詩や歴史を反映しているということです。

地域ごとの踊りの写真をおみせしたいと思います。

南部の踊り



これは、南部地域の踊りです。左の写真は、バラタナティウム、下の写真は、モヒニアッタム、右の写真は、タイガーという踊りです。バラタナティウムとモヒニアッタムは、お寺で生まれました。タイガーダンスは、男性の踊りで、たけを用いるなどして、武道の動きをします。

北部の踊り

これは、北部地域の踊りです。右の写真は カタック、右の写真は バングラ、という踊りです。カタックは、ムガル帝国に 紹介されました。ドレスは、ペルシアの影響を受けています。バングラは、パンジャブ地方のダンスです。フォークダンスは、一般的に色彩豊かでリズムカルです。



東部の踊り



これは、東部地域の踊りです。左の写真はオリシ、右の写真はマンプリ、右の写真はビフ、という踊りです。オリシとマンプリは、それぞれの州の名前であるオリサ、マニプールにちなんでつけられました。ビフは、インドの新年である 4月15日を祝うときに踊ります。

西部の踊り

クラシックダンス
カタカリ



フォークダンス
ガルバ



これは、西部地域の踊りです。左の写真はカタカリ、右の写真は、ガルバという踊りです。カタカリは、たくさんの化粧をし、特別なドレスを着て踊ります。ガルバは、棒やバケツやポットや皿やハンカチなどを用いたり、ただ手を叩いたりして踊ります。この踊りは、ナヴァラトリという9日間、国中で祝られるお祭りの期間に、踊ります。

現代の踊り

融合：クラシック&フォーク



そして、これは現代の踊りです。現代の踊りは、クラシックとフォークが混ざりあっており、地域ごとの特徴も混ざりあっています。 ♪

ベンガル語と日本語のポライトネス

ラキット工藤昭子

1. はじめに

は既婚女性を中心としたベンガル地方の年中行事の一つである (c. f. 外川, 2001)。この時期に、ベンガル地方では嫁いだ娘が里帰りすることが多い。学校も1ヶ月余りの長期休暇に入るため、子連れで里帰りしやすい環境になる。久しぶりに会える両親や兄弟、友人、知り合いなどとの交流の機会が増えると、「ポライトネス」に配慮した行動の頻度は高まると考えられる。

「ポライトネス」とは、対人関係における「よく思われたい」「受け入れられたい」という積極的に人に関わりたいという思いと、反対に、「踏み込まれたくない」「邪魔されたくない」という否定的な思いと関係している (c. f. Brown & Levinson, 1978¹)。

本稿では、という多くの人の交流が見られる時期であるということから、「ポライトネス」について考えるために、「ペンを借りる」という軽度の依頼表現を例にとり、ベンガル語話者のポライトネス・ストラテジーについて、若干の調査を行い、その結果を報告する。

2. 「ペンを借りる場合」の敬語行動に関する知見

井出他 (1986)、田中 (2004) により「ペンを借りる」場合の敬語行動についての知見がある。井出他は「ペンを借りる」言語表現を、日本の大学生525名、アメリカの大学生572名を対象に、使用可能なものを選択させた。20の社会的属性を持った人物カテゴリーに対し、日本語話者は社会的地位により使い分けしていたが、英語話者は社会的地位よりも親疎関係によって丁寧度に差のある表現を使い分けていたという結果になった。井出他 (1986) の調査は、被調査者に自由に文生産をさせていなかったため、表現が自然言語から距離があるという問題がある。

田中 (2004) はドイツ語と日本語の「ペンを借りる」表現の対照研究をした。日本人313名、ドイツ人167名に「ちょっとだけペンを貸してほしい」場合の文を自由記述させた。日本人の作成したデータは、肯定疑問「貸してくれますか」、否定疑問「貸してくれませんか」、終助詞「か」の有無（「貸してくれますか」/「貸してくれます」）、終助詞「ね」の有無（「貸してね」/「貸して」）、前置き表現である「ちょっと」「ちょっとだけ」「すみませんが」「申し訳ありませんが」の有無（「ちょっと(だけ)貸してもらえる」/「貸してもらえる」）などがあつた。田中 (2004) の結論では「肯定疑問・否定疑問による丁寧度の違いはあまり見られない」「終助詞“か”“ね”の有無による違いは明確ではない」「前置き表現でも“ちょっと”“ちょっとだけ”はつかない方が丁寧な傾向が若干みられるが、“すみませんが”“申し訳ありませんが”などはついた方が丁寧さが増す傾向がある」ことが見出された。また「聞き手に決定権を与えるかどうかにより命令形式（「貸して」「貸してください」）より、問いかけ形式（「貸してくれる？」）があり、問いかけ方式の方が丁寧さが増す傾向があるとしている。また、日本人は相手が親しいほどぞんざいになるが、親しくなっても年上の相手にはぞんざいにならず、一定の丁寧さを保つ傾向があることがわかった。ベンガル語圏の「ポライトネス・ストラテジー」は、文化・社会の構造が異なるため、米国・ドイツより、日本と比べ大きく異なる可能性がある。ベンガル語と日本語の対照研究²はまだ少ない上、ポライトネスの研究は見当たらない。本稿では、軽度の依頼表現における、ベンガル語話者のポライトネス・ストラテジーについて焦点をあてる。

3. 「ペンを借りる場合」のベンガル語話者のポライトネス・ストラテジー

3. 1 目的

ベンガル語話者が「ペンを借りる場合」に、相手にどのような「ポライトネス・ストラテジー」を使用するのか。

3. 2 調査の方法

3. 2. 1 調査対象と時期

2001年7月に実施。インド、西ベンガル州ビスワバラティ大学の大学生60名。

3. 2. 1 手続き

ペンを借りる場合に、最もフォーマルな態度で表現する文を1文、自由に記述してもらう。

1 Brown (文化人類学) と Levinson (言語学) によれば、人間には人とのかわりにおける欲求があり、それが「ネガティブ・フェイス」「ポジティブ・フェイス」という二つのフェイスがあるとす。a. 「ネガティブ・フェイス」：自己の領域と自己の行動の自由を守りたいという誰もが抱く欲求、b. 「ポジティブ・フェイス」：他者からの評価と他者による受容を得たいという誰もが抱く欲求。「フェイス侵害行為 (face-threatening act [FTA]) により欲求が満たされず、フェイスが脅かされる可能性があるときは、ポライトネスはそのフェイスの侵害を補償・軽減したり回避したりするためにフェイスを保持するように機能すると仮定されている (Brown & Levinson, 1978:58, 61, 70; c. f. 滝浦, 2005)。

2 e. g. Uddin, Md. Monir (2007a) 日本語とベンガル語における対称詞の対照研究『日本語・日本文化』33, 37-54. Uddin, Md. Monir (2007b) 日本語・ベンガル語の待遇表現に関する対照研究『Ex Oriente』14, 375-377. 頓宮勝 (1992) 「日本語とベンガル語—比較文化的視野での一考察」『奈良教育大学紀要人文・社会科学』41(1), 237-247. 奈良毅 (1986) 「ベンガル語 (日本語動詞のすべて〈特集〉) — (諸言語の動詞と日本語の動詞)」『国文学：解釈と鑑賞』51(1), 182-184.)

3. 2. 2 分析の枠組み

相手を配慮するポライトネス・ストラテジーが、文の中でどのぐらい使用されているかを人数により整理する。ポライトネス・ストラテジーの内容は井出他（1986）、彭（2004）を参考にポライトネス・ストラテジー（以下、PS）PS1~PS13とした。ポライトネス・ストラテジーを使ったとみなされる内容の有無を人数により整理した。ポライトネス・ストラテジーは1文の中に加算的に生じる。

本稿のベンガル語話者の「ペンを借りる場合」のポライトネス・ストラテジー（PS）

- PS1 尊敬する人向けの人称代名詞を使用した場合 apnar koromti ekbhar deben?
 あなた様の ペンの方 一度 くださいますか
- PS2 尊敬する人の動作の動詞活用 apnar koromti ekbar deben?
 あなた様の ペンの方 一度 くださいますか
- PS3 補助動詞を可能形にして許可を求める表現 ami ki ekta korom pete pari?
 私 1つ ペンを もらえますか
 Apni ki amake ekti korom dite paren?
 あなた様は 私に おひとつ ペンを くださることができますか
- PS4 コト化表現³ apnar koromta ektu dewa jabe?
 あなたの ペンの方 ちょっと あげることが 可能ですか? ⁴
- PS5 ナル式表現 tor kache ekta korom hobe?
 あなたのところに ひとつ ペン ある (生じる) ?
- PS6 「ご親切を賜り」という内容の前置き表現を添加する
doya kore (otoba) anugroho kore, amake ekta pen deben?
 ご親切を賜って 私に お1つ ペンを くださいますか?
- PS7 「申し訳ありませんが」のように詫げる前置きを添加する
kichu mone korebenna, apnar koromta ektu dewa jabe?
 お気を悪くなさらないでいただきたいのですが あなたの ペンの方 ちょっと 下さることが 可能ですか
- PS8 理由・説明を文内に表現する
apnar koromta amake ektu lekhar jonno dile oshubidhe hobe?
 あなたの ペンの方 私に ちょっと 書くのに _____ くだしたら 問題 ありますか (生じますか) ?
Doya kore amake ki ekti korom deben, jodi apnar kache theke tahole.
 ご親切賜って 私に おひとつ ペン くださいますか、 もし あなたのところから (いただけるの) なら。
- PS9 IF節を用いた仮定式 (例: jodi~+依頼 (もし~なら+依頼))
apnar koromta amake ektu lekhar jonno dile oshubidhe hobe?
 あなたの ペンの方 私に ちょっと 書くのに _____ くだしたら 問題 ありますか (生じますか) ?
- PS10 「ちょっと」を依頼表現の前につける場合
apni apnar ektu penta deben?
 あなた あなたの ちょっと ペンの方 くださいますか?
- PS11 「一度」を依頼表現の前につける場合
apnar koromti ekbar deben?
 あなたの ペンの方 一度 くださいますか
- PS12 目上の人だと明示される呼称・親しみを増す呼称で呼びかける
Dada, penta ektu deben?
 お兄さん、 ペンの方 ちょっと くださいますか?
- PS13 名詞+ti (「名詞+のホウ」にあたると考えられるe.g. 彭, 2004:76)
anugroho kore, apnar koromti deben?
 ご親切賜り あなたの ペンの方 くださいますか?
apnar kache ekti korom hobe?
 あなたのところに おひとつ ペンが ありますか (生じますか) ?

3. 3 結果と考察

PS2>PS1>PS5>PS11>PS10>PS13>PS2>PS4>PS9>PS12>PS3>PS8>PS7の順で、ベンガル語話者のポライトネス・ストラテジーは多く用いられた。ポライトネス・ストラテジー(PS1~13)の使用された人数を図1と図2に示す。

PS2,PS1は、尊敬形動詞活用と尊敬形人称代名詞を用いるストラテジーであり、最も多くの被調査者が使用していたストラテジーであった。PS2の尊敬形動詞活用は60名中43名が、PS1の人称代名詞は半数の30名が使用していた。PS5, 6, 7, 8, 9は、2語以上の前置きや理由、IF節を添加することによりポライトネスを表すストラテ

3 客観的な表現として「貸してくれますか」より「貸すコトが可能か」のように、自然のなりゆきによって無理なく依頼内容を実現できるかを問う (cf. 彭, 2004)。このような表現をコト化表現と本稿で呼ぶことにする。

4 日本語訳は、ベンガル語のポライトストラテジーが分かりやすいように付記したので、日本語としては少々不自然である点をご了承願いたい。

ジーである。PS5の「doya kore(ご親切賜って)+依頼」のように2語以上により「ご親切を賜りたい」という意志を前置きとして明示し、依頼をするようなストラテジーが3番目に多く60名中24名であった。PS9:IF節(もし~なら+依頼),PS8:理由(~から+依頼),PS7:詫び(すみませんが+依頼)はそれぞれ,60名中5名,3名,2名と少なかった。「自然に依頼内容が実現される」ような表現によりポライトネスを表そうとするPS4:コト化表現,PS5:ナル式表現はそれぞれ60名中3名,8名であった。依頼内容が「ペンを借りる」よりも重要であるなら,もっと使用されることが考えられる。PS10:「ちょっと」+依頼,PS11:「一度」+依頼はそれぞれ60名中16名,23名でPS2尊敬形動詞活用・PS1尊敬形人称代名詞に次いで3番目に多かった。日本語でも「ちょっと」の機能は,「暗示的緩和(和らげ)」と「暗示的強調(強め)」の機能があることが報告されている(彭,2004:157)。田中(2004)が指摘しているように日本語の場合は「“ちょっと”“ちょっとだけ”はつかない方が丁寧な傾向が若干みられる」。ベンガル語の場合も同様のことが言えるのではないかと考えられる。しかしベンガル語は日本語には見られない「一度」(あるいは「一回」)という助数詞による表現を用いることで「ちょっと」と同じような依頼行為の「和らげ」「強め」の機能のある表現を用いていた。「ektu(ちょっと)」と「ekbar(一度・一回)」はほとんど変わらない機能を持つように思われる。

PS12:呼びかけ(dada(お兄さん))は,尊敬形人称代名詞や尊敬形動詞活用を共起させる呼びかけを行うことにより,相手を敬っているということを伝えるポライトネス・ストラテジーであるが,60名中5名により使用されていた。

PS13:「名詞+ti」による物に親愛を込める言い方により,依頼物を大切に考えているという言語表現をすることによりポライトネスを表すストラテジーは,60名中16名でありPS10「ektu(ちょっと)+依頼」と同数であった。PS13:「名詞+ti」はPS10「ektu(ちょっと)」PS11「ekbar(一度)」に準じた,依頼行為の「和らげ」「強め」の機能を果たすと思われる。

PS3:「可能形」にして依頼するストラテジーは,61名中8名であった。自分が可能か(~pari?(自分ができる?)),相手が可能か(~paro/paren?(あなたができますか?)),動作主が一人称と二人称(尊敬形二人称・普通形二人称)が想定できるため,ストラテジーとして利用しやすいと考えられる。

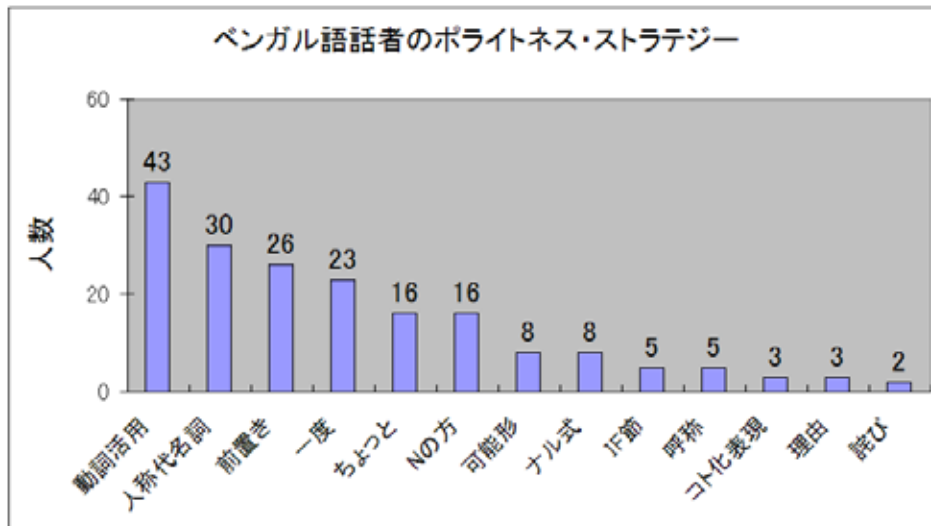


図1 ベンガル語話者のポライトネス・ストラテジー (N=60)

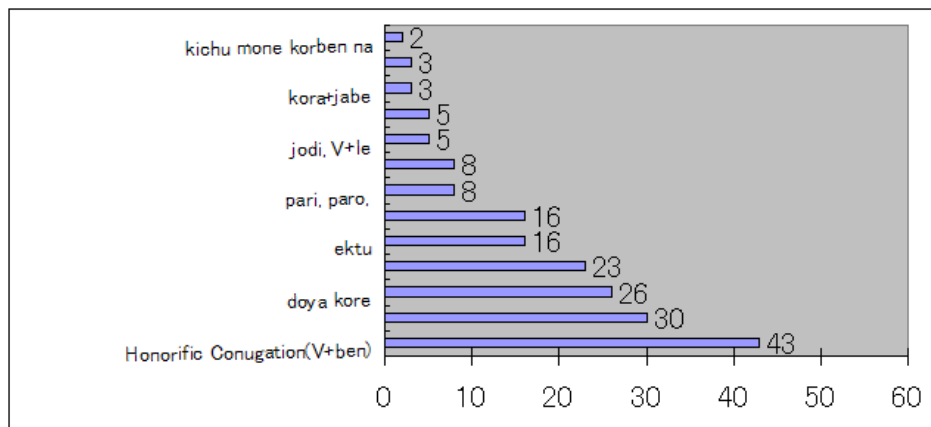


図2 Politeness Strategies by Bengali Speakers in the expressions of borrowing a pen (N=60 people)

ベンガル語の文末表現のポライトネス・ストラテジーを表1のようにまとめた。ベンガル語では動作主に尊敬の意を表すため、動作主尊敬を明示する「尊敬形人称代名詞 (apni, apnar) や「尊敬形動詞活用 (V+n, V+ben)」などを使用が60名中41名 (68%) にのぼった。一方、動作主を背景化し、誰が動作をするのかを明示せず自然発生的にコトが生じるような表現をした人が60名中19名 (31.6%) だった。

表1 ベンガル語：文末表現ポライトネス・ストラテジーの類型

動作主尊敬明示		人数
[問いかけ] 尊敬形動詞活用 (deben)	apnar koromti ekbar deben? あなたの ペン 一度 くださいますか	30
[問いかけ] 尊敬形動詞活用・可能 (paren)	doya kore apni ki amake ekti korom dite paren? ご親切いただいて あなたが私に おひとつ ペンを 下さることが できますか	1
[問いかけ] 普通形動詞活用・可能 (paro)	tomar penta amake dite paro? あなたの ペン 私に くれることが できる?	1
[相手に決定権与えず] [命令]尊敬形動詞活用 (din)	doya kore apnar koromta din na. ご親切いただいて あなたの ペンを ください な	9
動作主背景化		小計 41
[問いかけ] 動名詞 (dewa与える事)+可能 (jabe)	amake ki ekta korom dhar dewa jabe? 私に ひとつ ペンを かすことことが できますか	4
[問いかけ] IF節ナル方式 (~dile, ~hobe. もし~なら~なる)	apnar koromta amake ektu lekhar jonno dile oshubidhe hobe? あなたのペンを 私に ちょっと かくのに くだされば 問題 生じますか?	4
[問いかけ] N+hobe (Nが生じるか)	apnar kache ki ekti korom hobe? あなたのところに 一つ ペン ありますか (生じますか)	4
[問いかけ] 「pari (私が~できる)」1人称動詞活用	ami ki ekta korom pete pari? 私 一つ ペン もらえますか	5
[問いかけ] Pen+ache (ペンある?)	Pen ache ki? ペン ありますか	1
[相手に決定権与えず] 「pai (私が) ~もらう」	apnar koromta ektu pai. あなたの ペンの方 少し もらいます	1

小計19

ベンガル語と日本語を非常に異なる言語なので同じ条件で類型化することはできない。しかし、類似したポライトネス・ストラテジーは表2のようであった。

表2 ベンガル語と日本語の共通するポライトネス・ストラテジー

	ベンガル語のポライトネス・ストラテジー	日本語のポライトネス・ストラテジー
前置き	(1) ektu(ちょっと)+依頼 (2) ekbar(一度)+依頼 (3) doya kore / anugroho kore +依頼 (4) kichu mone korben na+依頼	(1) 「ちょっと」+依頼 (ちょっとだけ貸していただけますか) (2) すみません(が)+依頼 (3) 申し訳ありません(が)+依頼 (4) 恐れいりますが+依頼
可能	(1) ~pari?/~paro?(できますか?) (2) コト化(動名詞)+jabe?(~ことができますか?)	(1) Vて+もらえますか・もらえませんか (2) Vて+いただけますか・いただけませんか (3) おV+できますか
理由	動名詞+r+jonno(~のために)	(1) Vて+いただき+たい+んですけれど (2) Vて+ほしい+ん+だけど ちょっとペン貸してほしいんだけど

ベンガル語と日本語の類似しポライトネス・ストラテジーと相違あるものをまとめる。


A. 類似したポライトネス・ストラテジー

- (1) 前置き(「ちょっと」「すみません」など)を付加する
- (2) 「可能形」を用いる
- (3) 「理由」を添加する
- (4) 名詞+jabe, ~hobe(生じる)のように自然発生的に生じる表現を用いることにより丁寧さをあらわす

B. 異なるポライトネス・ストラテジー

- (1) 日本語の形容詞は、「いい」→「よろしい」のように、別の語が敬語となり、語を入れ替えることによりポライトネスを表す
- (2) 動詞は「お+V+てもいいですか」と、動詞の前に「お」を付加するのが日本語式だが、ベンガル語は尊敬形人称代名詞・尊敬形動詞活用を使用する。
- (3) また「けれど」と文を完全に終わらずに「察し」を相手に要求する表現を日本語では使用するが、ベンガル語には見られない。
- (4) 「ません+か」と否定疑問の表現がベンガル語には見られなかった。
- (5) 日本語では「Vて+ね」のように終助詞「ね」を付加したり、「か」を付加するがベンガル語では「文+na」「文+to」のように、動作主の行動を促進する機能をもつと考えられる終助詞が使用されており、それらには丁寧さを表す機能は見られない。
- (6) ポライトネスの感じられない表現としては、「Vてください」「Vて+よ」「Vて」「N」「N+ある？」が日本語においてあげられる。しかしベンガル語では相手に決定権を与えない命令形式（*~din*(ください)）でも尊敬形動詞活用を使用しているため、敬意を表すことができる。

4. まとめ

依頼表現は「ネガティブフェイス」に含まれるが、どのように丁寧に相手に依頼内容を伝えるかが大切である。ベンガル語も日本語も言語構造が異なるにもかかわらず、相手に敬意を明示したり、自然発生的表現により「距離」のあることで丁寧さを出そうとする点で共通点がみられた。今回は日本語のデータを田中（2004）に頼ったため両言語のポライトネス・ストラテジーを同じ条件で捉えることが難しかった。しかしベンガル語話者のデータは実際の調査結果を基にしているため、多少なりとも両言語の「フェイス」について考えるきっかけになったのではないかと思う。で、文化・言語・社会を超えた「ポライトネス・ストラテジー」の頻度の高い暖かいコミュニケーションが溢れることを祈る。 

<参考文献>

- 井出祥子他（1986）『日本人とアメリカ人の敬語行動：大学生の場合』南雲堂
 滝浦真人（2005）『日本の敬語論：ポライトネス理論からの再検討』大修館書店
 田中優子（2004）「依頼表現の日独比較—ベンを借りる場合」『計量言語学』24(4)198-213.
 外川昌彦（2001）「司祭の儀礼と女性の儀礼：インド・ベンガル地方の女神祭祀と女性」『アジア・アフリカ言語文化研究』61, 115-127.
 彭飛（2004）『日本語の「配慮表現」に関する研究—中国語との比較研究における諸問題』和泉書院
 Brown, R. and S. Levinson (1978) “Universals in Language Usage: Politeness Phenomena.” In Questions and Politeness. Ed. E. N. Goody, Cambridge: Cambridge University Press.

2009年コルカタの夏 Summer in Kolkata, 2009

吉田 美紀 Miki Yoshida

バンコク発、タイ航空313便。0時45分。真夜中のコルカタ国際空港に着く。この夏、何度この便に乗ったことだろう。4月から東京―インドを8往復。私は約80日を夏のコルカタで過ごした。

ターミナルを出ると、空気がインドの薫りになる。タクシーの客引きや、勝手に私の荷物カートを押してチップを要求する輩をぬって、迎えの車を探す。いつもの運転手が私を見つけ、かなり年季の入った車Tata Indicaに荷物を積む。車が薄モヤの中、市内へと走り出す。その瞬間、私はタイムスリップしてしまう。ボーっとした霞に浮かぶ薄暗い街路灯。既に眠りについた沿道の集落に、時々まだ開けている屋台の暗い蛍光灯。きっと30年前も同じ景色だっただろう。そんな思いで黙って外を眺めていると、8時間前にいた東京の世界から、一挙に30年前に遡った別世界へ滑り込んでいく。

この夏80日もコルカタに滞在したのは訳がある。私は5年ほど前からコルカタで、現地地の団体の協力を仰ぎ職業機会創出プロジェクトを走らせているが、その一つ、農村女性を対象にしたカンタ刺繍のプロジェクトで、春先に東京から大量受注した刺繍のブラウス製作の大幅遅延等が起こり、現地に滞在してプロジェクトを軌道に乗せなければならず、頻繁なインドとの往復と長期滞在をするようになった。初めての真夏のコルカタの滞在であった。

遅延を一刻も早く回復しなければならない状況の中で、それを妨げる予想外の事が次々と起こった。大型サイクロン・アイーラ。インド総選挙。4回の大規模ストライキ。お祭り。刺繍の女性や縫製人の病気・突然の欠勤。何度約束しても届かない刺繍用のシルクの生地。打合せとは異なるデザインや刺繍をしてくる者。生地の汚れ等々。チャーターした車で毎日作業先を何か所も回り、こうした状況への対応の連続。

5月末のサイクロン・アイーラは、日本では報道されなかったが大災害だった。17年ぶりと言われる大型サイクロンで、コルカタを直撃。大暴風雨。市内のいたる所で電柱や1m近い直径の街路樹の大木が根こそぎ倒れ、道路は通行不能。池のようになった市内。電線、通信線が切れ、インフラ麻痺。村では屋根が吹き飛び、沿道の大型広告塔の看板も破れて、いつ落ちてくるか、危ない。コルカタ市内は電気不通で、3晩、不気味なほど真っ暗だった。仕事に人々が出て来れず、また仕事が遅延。

そんな時、私はヘマをしてしまった。サイクロンの3日前にコルカタに着いたのだが、空港でスーツケースが出て来なかった。タイ航空から荷物が届いたという電話を受けたのは、アイーラが直撃の日。外は既に嵐。この天候の中、空港まで取りに行くのを躊躇ったが、もう着替えの服も手元にないし、仕事に必要な物もスーツケースに入っているので取りに行くしかない。そこで、荷物の受取に必要な、空港でクレーム処理をした時の書類を探したが、これがどうしても見つからない。書類は諦めて、空港

に向かった。空港ターミナルはセキュリティーが厳しく、いくつも許可をもらってようやく中に入る。タイ航空のオフィスに行き、miss handled baggageの引き取りの旨伝える。タイ航空は、夜中の発着便のみなので、昼間はオフィス番の契約社員が1名いるだけだ。クレーム処理時の書類を紛失したと告げると、その書類がなければ荷物は渡せないとわれ、もう一回探して出直してくるよにと言う。例外処理はしてくれない。この暴風雨の中を?! その荷物は私の所有物だから渡して欲しいと粘ると、それでは上司がOKならば渡す、とボスに電話をしてくれた。が、そのボスも、「書類を再度探して本職員が出揃う夜8時以降に出なおすように」と言う。契約社員は、「その書類がなければボスが来ても、荷物は渡せないと思うよ。タイ航空はOKでも、税関が通してくれない」と言う。要するに、書類がないのに荷物を渡したというリスクを誰もとりたくないというのがわかった。しかし書類は紛失しているから、ない。途方に暮れていると、携帯電話が鳴った。従兄弟のバブラからだった。別件の電話だったが、今の状況を話し、書類紛失の証明でもないと荷物を受け取れないと話す、「それなら警察に行き、Police diaryというのがあるから、紛失をレポートして、そのコピーをもらってあげれば良い」と言う。Police diaryというのは初めて聞いた。これは、警察に紛失等を届けると、警察日記帳にその旨を記載し記録に残すものだった。タイ航空も、その紙があれば荷物を引き渡すと言う。すぐに警察に向かった。ターミナルの出口で待っていた運転手にエアポート・ポリスへ行くように頼んだ。外は土砂降り。「場所知ってる」と運転手が連れて行ってくれたオフィスは、空港敷地内にはあるが、空港内は管轄外というオフィスだった。英語が殆ど通じない警察官にさんざん説明したあと、それがようやくわかった。空港管轄のポリスはターミナルの向かい側だよと教えてもらう。車を降りてからオフィス入口まで、暴風雨の中、池のような水たまりをジャボジャボ歩いた。全身グショグショで、洋服を着たままシャワーを浴びた状態だ。英語が通じない警察官とのやり取りに四苦八苦していると、言葉がわかる上司が出てきた。親切な人だった。事情を説明し、Police diaryを書いてもらい、再びタイ航空オフィスへ。今度は引き渡してもらえた。依然大雨の中、宿泊先に戻る。入口の門に着くと、玄関までの500mを超す長いアプローチには大木が何本も倒れており、車が入れない。ゲートに居合わせた支配人が、「これから木を裁断して道を空けるので、3時間位したら戻って来て欲しい。それとも、傘を貸してあげるからその荷物を歩いて玄関まで運ぶか?」と聞く。スーツケースを押して歩ける状態ではなかったので、少し離れた主人の実家で休ませてもらうことにした。

数日後、コルカタから3時間程離れたラナガットへ行った。ここでも今回の刺繍作業をしている。サイクロンが去った後、夏のベンガルは増々暑さを増していた。この日は46度まで上がった。工場の片隅を借りて現地の人々と作業をしていたが、突然電気が止まる。コルカタでも毎日のことだが、電力供給量が足りないので午後になると3時間位パワーカットになる。空調も切れ、扇風機も止まる。暑い。46度はさすがに暑い。汗が吹き出し滝のように流れ

る。室内が暗いので窓を全開にして明かりをとる。網戸がないから、開けた窓から蚊がワンサカ入ってくる。渋滞で車のエアコンを切って窓を開ける時もそうだが、この蚊がたまらない。マラリアやデング熱の蚊にでも刺されたら大変だ。「ラナガットの蚊はコルカタの蚊より安全」と現地の人は言うが、私はたまったものではない。

この暑さ、さすがに地元のインド人も体調を崩す。「暑いから」と言って突然仕事に来ない人もいる。「明日は総選挙の投票日だから」「バスがストだから」仕事に来れないと言う。「投票日に何するの?」と聞くと、投票に行くだけ。投票所が混んでいるというが、「それなら朝一番に投票して、午後から仕事できるよね」「バスがストでも、あなたいつも歩いて来るんでしょ? 来れるじゃない。」とその度に一人一人話す。

悪気もなく、こういうメンタリティーなので、スケジュールが遅れていても、夜なべをして間に合わせるという発想はあまりない。しかし、中には有難いことに頑張ってくれる人もいる。7月中旬のことだった。明日は刺繍が11枚分出来上がってくるという約束の前の晩、村の取り纏めの女性であるPritiに確認の電話を入れた。その日の午後作業場で会っているが、念の為。「大丈夫ね?」というと、「No! No!」と受話器の向こうで叫んでいる。「どうしたの?」「リタが刺繍を完成してこなかった! 昨日まで、大丈夫だって言ってたのに!」この1枚の刺繍が来ないことは大問題だった。私もインドの現地に張り付いてプロジェクトをまわし、東京の取引先に、それまで大遅延していた納品を何とか挽回していた時に、ここでまた1枚でも遅延すると、今後一切仕事を受注できなくなる。プロジェクト全体に対して、致命的な1枚だったのだ。明日の1時には縫製にまわさないと、東京への出荷に間に合わない。「何としても、他の女性と手分けして刺繍を完成して。さもないと、もうこのプロジェクト自体続けられなくなる」という私に、Pritiは「明日の午前中に仕上げるなんて、impossible! 刺繍が半分も終わってないんだから。見ればわかる! もうリタには仕事を回してあげない!」と、つたない英語で叫んでいる。電話が切れた。もう絶対絶命のピンチだと思った。何とかインドの女性の役に立ちたいと願って行ってきたプロジェクトだったが、もうこれで断念か。

いても立ってもおられず、その村に向かうことにした。ベンガル語でのコミュニケーションが必須だと思った私は、偶々日本から数日コルカタに来てくれていた夫(Bengali)に、「本当に申し訳ないけれど、この夜更け、今から村に行くから一緒に来てもらえないかしら」と頼んだ。今の電話を聞いていた夫は「一緒に行くよ」と言ってくれた。ありがとう。車の中で、夫はPritiに状況を電話で聞

いてくれていた。村に着き、真っ暗な田舎道を夫と歩いた。Pritiは私との電話が切れた後、「そうだ、カニングにいる3人の女性が完成に近い刺繍をしているはず」と気づき、早速電話を入れたと言う。事情を聞いたカニングの3人の女性は、「わかった。私たちの刺繍は8割は仕上がっているから、今日は夜なべして頑張ってみる。明日は早朝から3人でそちらに行き刺繍する。手分けして、何とか昼までに仕上げよう!」と言ってくれたという。感激の驚きだった。カニングは、この村から電車で2時間かかる遠い村なのだ。それでも急遽来てくれる。Pritiはリタの無責任さをベンガル語で夫にさんざん話して、すっきりした様子だった。

翌日11時に、刺繍を受け取りに村へ行った。カニングの3人娘は床に座り込んで刺繍をしている。朝7時に家を出たという。やがて問題のリタの先輩にあたる村の女性も来た。どうも遅刻して来たらしい。カニングの3人は、その姿を見るなり大声で怒鳴った。私はベンガル語はわからないが、様子からすると、「あなたの後輩のリタが起こした問題なのに、こんなに遅く手伝いに来るなんて!」といったようなことだ。そして、またせせせと刺繍をする。結局5人の女性で手分けして、刺繍のパーツを完成させていった。その姿を見て、胸が熱くなった。他人が起こした問題だが、何とかしようと遠い村から早朝に出てきてくれた。なんて有難いのだろう、と。私は隣の部屋で別の作業をしていたが、涙が止まらなくなった。Pritiが部屋に入ってきて、私の涙を見た。びっくりしているので、「有難いなあ、と思ってね。涙が出てきた」というと、刺繍の女性達に、「美紀が泣いてる。美紀が泣いてる」と大声で言う。「ちょっと、そんなこと大声で言わないでよ。」と私は部屋から出て、カニングの女性たちに、「本当にありがとうね」と声をかけていった。2時までかかったが、刺繍は無事完成。それを抱えて、私はコルカタの縫製職人の所へ車を飛ばした。

こんな夏のコルカタでの楽しみは、何と言ってもマンゴである。シーズンは真夏なので、灼熱のインドに行かなければ食べられない。インドマンゴをこよなく愛す私は、いつかインドで思う存分マンゴを食べたいと思っていた。西ベンガル州で採れるヒムシャガールは絶品。そしてラングラ、チョウサと月変わりで旬の種類も変わる。西から来るアルフォンソも絶品。幸せである。

7月末。タイ航空314便。深夜2時コルカタ発、バンコク行きの便に乗る。東京の生活へ、back to the future。そして数日後、またコルカタへ戻る、そんな夏の日々であった。☺

Collection of Haiku Poems

Compiled by Venkatachalam.M

能舞台ひいて讚美歌涼しかり	萬地郎
長崎や寡黙ゆるさぬ蝉しぐれ	眞
能楽堂に聖歌流るる原爆忌	千恵子
雨の中笛と讚美歌ひびきあう	アラベラ
三才の夏につながる能舞台	孝禮
万国の笑顔集えり長崎忌	充
原爆忌みたましめよシテの舞	康子
長崎忌暑さ忘れて北京鴨	ヨアヒム
砂あそび涙のあとの氷菓子	朱実
庭をみるミーミーがきこえる初の蝉	カール
原爆忌能の舞台にマリア舞い	裕子
霧晴れて猫の尾止まり大地揺れ	アルネ
地震でも揺れなかったのは自身だけ	ムルガン
長崎忌笛が祈りの晩鐘に	眞
燔祭とは納得いかぬ長崎忌	眞
緋扇もて被爆地獄をシテが舞う	萬地郎
長崎忌十字架の立つ能舞台	萬地郎

